

বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
আবদুল মুক্তাদির

ছেপেছেন :
শ্রীপ্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা—১

মূল্য ছয় টাকা।

সূচীপত্র

১ দৈবাৎ যদি হতাম
১১ স্বাধীনতার দিবসে দু'টি প্রতিবেদন
১৯ লেখকের স্বাধীনতা (একটি ভাষণ)
৩১ স্বাধীনতা বনাম শুভবুদ্ধি
৩৬ সংস্কৃতি প্রসঙ্গে
৪৩ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
৫০ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে ?
৫৬ শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা প্রায় নৈরাজ্যের সম্মুখীন
৬৮ হুমায়ুন কবীরের হত্যা-প্রসঙ্গে কয়েকটি জিজ্ঞাসা
৭২ সমাজতন্ত্রের পথ ও পাথেয়
৭৮ স্বাধীনতার পরবর্তী ভূমিকা
৮১ ভাষার সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা
৮৪ একুশের উত্তরাধিকার
৮৬ বইয়ের দোকানে বই পাওয়া যাবে না কেন ?
৯১ নারী-স্বাধীনতা প্রসঙ্গে
৯৩ মনীষী আবুল হুসেন স্মরণে
৯৯ শান্তির পথ ও পাথেয়
১০১ মুনীর চৌধুরী
১০৫ কবিকে শান্তিতে থাকতে দিন
১০৮ শান্তির পথ-সন্ধানী
১১১ বেতার শিল্পীদের পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে

১১৫ গণতন্ত্র পরমতসহিষ্ণুতা
১১৯ বুদ্ধদেব বসু ও মোহিত প্রসঙ্গে
১২৮ জীবনের নাটক
১৩১ স্বাধীনতার পর
১৩৩ আমাদের রাজনীতি ও সংবাদপত্র
১৩৬ ফজলুল কাদের চৌধুরী : যার যা প্রাপ্য
১৪০ বর্তমান বিশ্ব ও বাংলাদেশ
১৪৩ বাংলার মুখ দেখিয়াছি

দৈবাৎ যদি হতাম

'আরব বেদুইন' নয়—বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী! এ দুনিয়ায় অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়। ঘটে যায় অচিন্তনীয় ঘটনাও। অভাবনীয়ের নজীরও বিরল নয়। কোন এক অলৌকিক উপায়ে আলাদীনের প্রদীপটা যদি আমার হাতে খামাখা এসেও যেতো, তা হলে বশংবদ দৈত্যটার কাছে আমি যে 'গণভবন'টাই চেয়ে বসতাম তা নয়. তেমন কোন কুমতলব আমার এখন যেমন নেই, আমার বিশ্বাস কখনো হতো না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মতো, যা আসল প্রধানমন্ত্রীও একাত্তরের পঁচিশে মার্চের আগে কল্পনা করেন নি তেমন একটা অঘটন যদি আমার জীবনেও সত্য সত্যই ঘটে যেতো তা হলে সে সাংঘাতিক অবস্থার প্রথম মোকাবেলা আমি কি করে করতাম সে সম্বন্ধে আমার মনে যে সব চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়েছে, এখানে সে সবকেই শুধু ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করছি। রাতারাতি এমন একটা অঘটন যদি ঘটেই যেতো, কোন এক ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে যদি দেখতাম আমি আর বাংলাদেশের এক মফঃস্বল শহরের ক্ষুদে লেখক নই, হয়ে গেছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এবং দেখতে পাচ্ছি এখন সারা দেশ রয়েছে আমার পেছনে, সাড়ে সাত কোটি মানুষ আমার কথায়, আঙুলের একটুখানি ইশারায় ওঠে বসে, এমন কি প্রয়োজন হলে জানমাল কোরবানী দিতেও যেন তৈয়ারী। তা হলে আমার জীবনের এ ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি সর্বাগ্রে ইতিহাসের দিকেই ফিরে তাকাতাম। সর্বাগ্রে খুঁজে দেখতাম নিজেদের ইতিহাসে কোন পথনির্দেশ আছে কি না—যা অনুসরণ করে আমি আর আমার দেশ হতে পারে উপকৃত। যে নবীর প্রচারিত ধর্মের মধ্যেই আমার জন্ম আর প্রতিপালন এবং যা আজো আমার সামাজিক আর আধ্যাত্মিক জীবনের অনুষঙ্গ। জীবনের এ কল্পনাতীত সন্ধিক্ষণে নিঃসন্দেহে আমি সর্বপ্রথম সে নবী জীবনের দিকেই তাকাতাম চেয়ে। চেষ্টা করতাম

তাঁর জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে দেখতে। জীবনে তিনিও জয়-পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছেন বহুবার। দেখেছি পরাজয়ে যেমন তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েন নি, হননি কিছুমাত্র অধৈর্য কি জিঘাংসু, তেমনি জয়েও হননি গর্বিত অসহিষ্ণু এবং এতটুকু প্রতিহিংসাপরায়ণ।

জানি আমাদের এযুগের সমস্যার সঙ্গে নবী-জীবনের আর ঐ যুগের সমস্যার আদৌ মিল নেই, রয়েছে দু'য়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। তবুও আমার বিশ্বাস তাঁর নীতি, আচরণ আর আদর্শের মধ্যে এমন শাশ্বত সত্য রয়েছে যা আজকের দিনেও মিথ্যা কিংবা মূল্যহীন হয়ে যায় নি। যার অনেক কিছু, বিশেষ করে যে-সবের সঙ্গে মনুষ্যত্বের রয়েছে সম্পর্ক তা অনুকরণ আর অনুসরণ করে আমরাও নিঃসন্দেহে হতে পারি লাভবান।

শত্রুর নির্মম নির্যাতনের মুখে আমাদের নবীকেও একদিন নিজের প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করে যেতে হয়েছিল, যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রীকেও দেশ-শত্রুরা বাংলাদেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাঠিয়েছিল বহু দূরে নির্বাসনে। দেড় হাজার বছর আগে নির্যাতনের রূপ ছিল এক রকম, এখন দেড় হাজার বছর পরে নির্যাতন নিয়েছে ভিন্ন রূপ। সেদিন মক্কায় মহানবীর শত্রুর অন্ত ছিল না। যেমন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবেরও হয়তো আজ শত্রু তথা বিরুদ্ধবাদীর অন্ত নেই। তবুও বিজয়ী মহানবী মক্কায় প্রবেশ করেই শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ক্ষমার অভয় হাত। ঘোষণা করেছিলেন, সকলের প্রতি সার্বজনীন ক্ষমা। ইতিহাসে এ ক্ষমা নবী-চরিত্রের অসাধারণ মনুষ্যত্ববোধ আর মহানুভবতার এক অক্ষয় নজির হয়ে রয়েছে। জানি আধুনিক রাষ্ট্রনায়করা নবী নন। নবী-চরিত্রের উদারতা, মনের প্রশস্ততা, অসীম ক্ষমাশীলতা এঁদের কাছে আশা করা যায় না। অধিকন্তু নবীদের মস্ত বড় সুবিধা ছিল তাঁরা দলীয় ছিলেন না মোটেও। তাঁদের কোন দল ছিল না, ছিল না শ্রেণী কি গোষ্ঠী। প্রয়োজন হতো না তাঁদের সংকীর্ণচেতা দলীয় নেতা, উপনেতা বা সমর্থকদের খুশী করার। ফলে অতি সহজে তাঁরা মহত্ত্ব আর মনুষ্যত্বের নামে দিতে

পারতেন সাড়া। কারো মুখের দিকে চেয়ে কিংবা সমর্থক হারাবার ভয়ে তাঁদের নিতে হতো না কোন সিদ্ধান্ত, যা বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের নিতে হয়। ফলে ন্যায়-নীতি আর সুবিচার এদের হাতে এখন পদে পদে পদদলিত হতে থাকে। এও সত্য, মহানবীর যুগের আরবের অবস্থা আর বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা এক নয়। তবুও আমি মনে করি ক্ষমা, সহিষ্ণুতা আর মহত্ত্ব এমন কিছু গুণ যা চিরশ্রদ্ধেয়, চিরকাল অনুসরণের যোগ্য, যা অনুসরণ করে মহানবী আরবদেশে শান্তি আর ভ্রাতৃত্বের সূচনা করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, অনুসরণ করলে আমরাও তেমন সুফল থেকে বঞ্চিত হতাম না। উদার মানবতা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে।

প্রতিশোধ প্রতিহিংসা কোন সমস্যারই সমাধান করে না, বরং তাতে বপন করা হয় চিরন্তন বিরোধের এক বিষবৃক্ষ। দণ্ডের দ্বারা কোনদিনই মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। এ করে পাওয়া যায় না জনগণের আন্তরিক আনুগত্যও। রাওয়ালপিণ্ডির জিন্দানখানা থেকে ছাড়া পেয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে বিজয়ী বীরের মর্যাদা নিয়ে ফিরে এলেন, তখন আমার মতো অনেকেই আশা করেছিল তিনি এবার তাঁর ক্ষমার অভয় হাত প্রসারিত করে দিয়ে দলমত-নির্বিশেষে দেশের সবাইকে উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়ে বলবেন: 'হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ আর ধর্ষণ এ চারটি অপরাধ ছাড়া আর সব অপরাধ মাফ। এসো ভাই, সবাই মিলে বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তুলি।" আমি, হলে এ বলতাম এবং সে সঙ্গে হয়তো এটুকুও যোগ করতাম: 'দল বড় নয়, দলের ঊর্ধ্বে দেশ, সবার উপর দেশের মানুষ। অতএব, আজ কোনরকম দলীয় স্বার্থে প্রতিশোধ কিংবা প্রতিহিংসা নয়। সবাই এসে দেশ গড়ার কাজে হাত মিলাও আমার সাথে। ভুলে যাও অতীতের ভুল-ভ্রান্তি, তাকাও সামনের দিকে, নতুন বাংলার ভবিষ্যতের পানে।"

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এ যদি তিনি করতেন তা'হলে তাঁর এ মহানুভবতাও ইতিহাসে আর একটি অনন্য নজির হয়ে থাকতো।

ঘটনাচক্রে আমি যদি সত্যি-সত্যি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যেতাম তা'হলে এই আমি করতাম। সুনির্দিষ্ট অপরাধ ছাড়া আমার দেশের কোন মানুষকেই আমি গ্রেফতারের হুকুম দিতাম না কিছুতেই। কেউ দিয়ে থাকলে তা রদ করার ব্যবস্থা আমি নিজেই নিতাম। মানুষ স্থান-কাল আর অবস্থার দাস একথা ভুলে গেলে মানুষের প্রতি অবিচার করা হয়। হানাদারদের আমলে কলকাতা কি আগরতলায় বসে যা বলা বা করা সম্ভব ছিল, ঢাকা-চট্টগ্রামে বসে তা করা কি বলা আদৌ সম্ভব ছিল না। এমোটা সত্যটা ভুলে থাকার কোন মানে হয় না। দখলদার হানাদারদের আমলে প্রতিটি বাঙ্গালীরই প্রাণের ঝুঁকি ছিল। সে অবস্থায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্রেফ প্রাণের দায়ে অনেকে অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজেই ভারতে এক বক্তৃতায় বলেছেন "আমি জানি আমার দেশের মানুষ, অনেকে বাধ্য হয়ে হানাদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে. তাদেরে আমরা ক্ষমা করবো।" ঐ করলেই তো হতো সমীচীন, সর্বতোভাবে মানবিক এবং বঙ্গবন্ধুর উপযুক্ত কাজ। বঙ্গবন্ধু মানে শুধু আওয়ামী লীগের বন্ধু নয়, সব বাঙ্গালীর, এদেশের সব মানুষের বন্ধু। শুধু আওয়ামী লীগের হতে গেলে বঙ্গবন্ধু কথাটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। খণ্ড দিয়ে অখণ্ডকে বুঝাতে চাওয়া ভ্রান্ত লজিক। গণতান্ত্রিক দেশে বহু দল থাকবেই, থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দেশে আগেও যেমন ছিল এখনো আছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন নূতন কথা নয়। বর্তমান অবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেকে এখন সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শোধ নিচ্ছে। অনেকে চরিতার্থ করছে ব্যক্তিগত স্বার্থ আর প্রতিহিংসা। এমন নজির ভূরি ভূরি। দেখলে মনে হয় সারাদেশ যেন এখন জণ্ডিসের মতো দালাল-ব্যারামেই ভুগছে। দালাল ছাড়া অনেকেই আর কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না চোখের সামনে। এ এক আত্মা আর আত্মবিনাশী ব্যাধি। এ মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীই দেশকে বাঁচাতে পারতেন। ইচ্ছা করলে এখনো পারেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এ ব্যাধিকে নির্মূল করার পরিবর্তে উলটো দালাল আইনের মতো এক বেআইনী আইন করে এ ব্যাধিকে

বরং আরো দায়মি-কায়মি করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বেআইনী বল্লাম এ কারণে যে, এ আইনে নাকি অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ড দেয়া না দেয়ার কোন এক্তেয়ারই রাখা হয় নি বিচারকের! সামান্যতম সন্দেহেও তিন বছরের কমে নাকি কাকেও যায় না দণ্ড দেওয়া। ফলে আইন আর বিবেকের সাথে যাঁরা বিচার করতে চান, সে সব বিচারকেরা এখন মহা ফাঁপড়ে পড়েছেন। কোন্‌টা রক্ষা করবেন — বিবেক না চাকরি? চালের দাম যেখানে ৮০ থেকে ১০০ — সেখানে বিবেক হালে পানি পাওয়ার কথা নয়। অতএব কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। চুলোয় যাক্‌ বিবেক আর ন্যায়বিচার, চাকরীই সই! এ হয়েছে এখন বিচারকদের অবস্থা। কিছুদিন আগে জনৈক মন্ত্রী নাকি এক হাকিমকে প্রায় ধমকের সুরেই বলেছিলেন।

ঃ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি নাকি দালাল আইনে অভিযুক্ত সব আসামীকেই খালাস দিচ্ছেন।

ঃ না স্যার, আমি ত সেদিন একজনকে সাত বছর দিয়ে দিয়েছি। হাকিমের ত্বরিত উত্তর। এভাবে অনেককে রক্ষা করতে হচ্ছে জীবিকা। ধরুনঃ আপনার উঠোনে ঢুকে হানাদার সৈনিক যদি বন্দুক উঁচিয়ে বলে, মুরগি দাও। মুরগিটা না দিয়ে আপনি পারেন কি? কোন্‌টা আগে, প্রাণ না মুরগি? নিশ্চয়ই প্রাণ। ইসলামে শুকর মাংস খেয়েও প্রাণ বাঁচাবার বিধান রয়েছে। অথচ এদিকে আপনার প্রতিবেশীর চোখে আপনি কি না এখন হয়ে গেলেন দালাল। আপনি হয়তো গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, হানাদারদের কেউ বন্দুক উচিঁয়ে বল্লেঃ আমাকে ক্যাণ্টনমেণ্টে পোঁছে দাও। না করার উপায় নেই। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী এখন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলে আপনি একজন দালাল। বন্দুকের মুখে মুরগি কিংবা লিফ্‌ট দেওয়ার জন্যও যে-কোন লোকের কমপক্ষে তিন বছরের কারাদণ্ড হয়ে যেতে পারে। কারণ এর কমে শাস্তি দেওয়ার বিধানই নেই দালাল আইনে। বেআইনী আইন আর কাকে বলে? ভাগ্যক্রমে বিচারে যদি কারো দণ্ড নাও হয়, তাতেও খুশী হওয়ার কিছু নেই, গোদের উপর বিষফোঁড়া। বিচারের আগে

গ্রেফতারকৃত হতভাগ্য বঙ্গবাসীকে এখন মাসের পর মাস দুর্বহ হাজতবাস ভোগ করতে হয়। এ বোধ করি কারো অজানা নয়। সরকারী এক মুখপাত্রের জবানীতে জানা গেছে এরকম একচল্লিশ হাজার বঙ্গবাসী এখন এভাবে হাজতবাস করছে। আইনে সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই বলে এ দুর্ভোগ চলবে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আমার জানামতে এরি মধ্যে কারো কারো হাজতবাস বছর পার হয়ে গেছে অথচ বিচারের কোন নাম-গন্ধও নেই। প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিকার বঙ্গবন্ধু হন, তা'হলে এদৃশ্য দেখে তাঁর বিচলিত হওয়ার কথা। আমি বিচলিত বোধ করছি বলেই এ লেখা।

হানাদারদের আমলে দীর্ঘ ন'মাস এ দেশের মানুষ যে অকথ্য নির্যাতন আর দুঃখ-কষ্ট ভুগেছে তা ইতিহাসের সব নজিরকে ছাড়িয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর তারা চেয়েছিল একটুখানি শান্তি আর নিরাপত্তা। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এখন গগনচুম্বী, তাও মানুষ শান্তি আর নিরাপত্তার খাতিরে সয়ে রয়েছে, সয়ে যাচ্ছে নির্বিবাদে। নূরুল আমিনের আমলে মাত্র একপক্ষকালের জন্য নুনের দাম ষোল টাকায় উঠেছিল, মানুষ তা বরদাস্ত করে নি, প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল সারা দেশ। এখন অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ। তবুও মানুষ চুপ করে রয়েছে। কারণ, মানুষ চায় না স্বাধীন বাংলাদেশে শান্তি আর শৃংখলা বিঘ্নিত হোক। সর্বস্তরের মানুষের একমাত্র কাম্য সরকার আর দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা লাভ করুক স্থিতিশীলতা, মানুষ ফিরে পাক নিরাপত্তা, কায়েম হোক আইনের শাসন। অধিকন্তু জনগণ এখনো প্রধানমন্ত্রীর উপর থেকে হারায় নি আস্থা। এ আস্থার সুফল শুধু একটা দল নয়, সমগ্র জাতির পাওয়া উচিত। আসল প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমার আবেদন, তিনি এদেশের সব মানুষের বন্ধু হতে চেষ্টা করেন। ভিন্ন দলের সব মানুষ দালাল নয়। অতি নগণ্যসংখ্যক মানুষ হয়তো দালালি করেছে বা কোন না কোনভাবে পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে করেছে সহযোগিতা। এমনকি শান্তি কমিটির সব সদস্যও দালাল ছিলো না। কেউ কেউ প্রকাশ্যে হানাদারদের চাপে পড়ে শান্তি কমিটিতে থাকলেও,

গোপনে আবার মুক্তিবাহিনীকেও করেছে নানাভাবে সাহায্য। আবার এমনও হয়েছে, অনেকে জানেই না যে, তারা শান্তি কমিটির সদস্য। সংখ্যা বাড়াবার জন্য অন্যরা তাদের নাম ওখানে জুড়ে দিয়েছে। এমনও দেখা গেছে সরকারী কোন চাঁইয়ের নির্দেশে কয়েকজন মিলে একটা কমিটি গঠন করে, তাতে অনুপস্থিত স্থানীয় বিশিষ্ট লোকদের নাম বসিয়ে দিয়ে প্রেসে একটা রিপোর্ট দিয়ে বাহবা পাওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের দেশে এমন ঘটনা বিরল নয়; অনুমতি নেওয়ার সাধারণ ভদ্রতাও অনেক সময় রক্ষিত হয় না। এসব মানুষ জানেই না তারা শান্তি কমিটির মেম্বার। এখন তারাও হয়ে গেছে দালাল নামে চিহ্নিত; তথা-কথিত উপনির্বাচনে কেউ কেউ ইচ্ছা করে যেমন অংশ নিয়েছে তেমনি অনেকে চাপে পড়ে অর্থাৎ সামরিক অফিসারদের হুকুমেও মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে বা দাখিল করতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে আবার সে চাপ আলগা হয়ে যাওয়া মাত্রই মনোনয়নপত্র করে নিয়েছে প্রত্যাহার। এঁদের সবাইকে দালাল বলার কোন মানে হয় না। বিশেষ করে যারা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে তাদের ত বটেই। প্রত্যাহার করে নেওয়া মানে নিজের ভুল বুঝে তা শোধরানোর চেষ্টা। মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে। ভুল বুঝেও ভুল পথ আকড়ে থাকাটাই অপরাধ। ভুল পথ থেকে ফিরে আসাও কেন অপরাধ বিবেচিত হবে? মানুষ ভুলের অধীন বলেই ইসলামে তোবার ব্যবস্থা রয়েছে। তোবা মানে মানুষকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া। আমার বিশ্বাস সব ধর্মে'ই অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। ঢালাওভাবে যে-সব ক্রিয়াকর্ম'কে এখন দালালি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তা অনেকে প্রাণের ভয়েই করেছে। কেউ কেউ করেছে জীবিকা হারাবার ভয়ে। এসব মানবিক দিককে বিবেচনায় আনা উচিত। মহত্ত্ব আর মনুষ্যত্বের বেলায় যে কোন ঝুঁকি নেওয়া যায় তাতে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রনায়কের গৌরব বাড়ে বই কমে না। কাল আর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বিবর্তিত হয়। এ বিবর্তনকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে, দেশ আর মানুষের বৃহত্তর ভাগ্য নিয়ে যে রাজনীতিবিদ্‌দের কারবার তারা এ বিবর্তনকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। তাই

একদিন যাঁরা মুসলিম লীগ করতেন আজ তাঁদের কেউ কেউ আওয়ামী লীগ, কেউ কেউ ন্যাপ, কেউ কেউ বা কমিউনিষ্ট পার্টি, আবার কেউবা জাতীয় লীগ করছেন। স্বয়ং আমাদের প্রধানমন্ত্রীও একদিন মুসলিম লীগ করতেন, তাঁর রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দী সাহেবও। মনে রাখা প্রয়োজন, পাকিস্তান না হলে কখনো বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হতো না। হতো পশ্চিমবঙ্গের একটা অংশ, বড়জোর ভারতের অন্য একটি প্রদেশ মাত্র। চিন্তায় যাঁদের অনীহা নেই আশা করি তাঁরা এদিকটাও চিন্তা করে দেখবেন। মুসলিম লীগ বহুবিধ ভুল-ভ্রান্তি করেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই বলে তার অতীত অবদানকে অস্বীকার করা উচিত নয়। অস্বীকার করা মানে আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে মুছে ফেলতে চেষ্টা করা। বলা বাহুল্য, তেমন চেষ্টা কখনো সফল হয় না।

অতীতে মুসলিম লীগেও বহু দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ আজো বেঁচে আছেন। কৃষক-প্রজা দলেও ছিলেন, অন্যান্য দলও ব্যতিক্রম নয়। সব দলই ভালোয়-মন্দোয় গঠিত। দেশের মানুষও তাই। সব দলের মানুষকে দেশ গড়ার কাজে আহ্বান জানিয়ে দেশ-শাসনের সুযোগ দেয়া হলে, আমার বিশ্বাস, দেশ আর দেশের মানুষ অধিকতর উপকৃত হতো। রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি স্বতন্ত্র শ্রেণী। এদের বিচার সে ভাবেই হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়।

দেশের শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা, উন্নয়ন, উৎপাদন সব কিছু নির্ভর করে প্রশাসনযন্ত্রের উপর—প্রশাসকদের কর্মদক্ষতা, আনুগত্য আর বিশ্বস্ততার উপর। এ জন্য তাদের চাকরীর নিরাপত্তা অপরিহার্য। তারা নিজ নিজ চাকরীতে সুনিশ্চিত হতে না পারলে তাদের যা সর্বোত্তম তা তার কিছুতেই দেশকে দিতে পারবে না। এর মানে এ নয় যে, দোষীকে শাস্তি বা অপসারিত করা যাবে না। নিশ্চয়ই করা যাবে, তবে তা আইনের পথে হওয়া চাই। তারা যদি অস্থির, চাকরি সম্বন্ধে অনিশ্চিত আর নিজেদের জীবিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা দোদুলামান অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়, তা হলে দেশের প্রশাসনযন্ত্র কিছুতেই মসৃণ আর সুষ্ঠুভাবে

লতে পারে না। তখন বৃহত্তর ক্ষতিটা হয় দেশের, রাষ্ট্রের আর জনগণের। আমলা তথা প্রশাসকরা যে-কোন সরকারের অপরিহার্য অঙ্গ। ওদেরে বাদ দিয়ে সরকার একদিনও চলতে পারে না। এখন কথায় কথায় সাসপেনশন আর ও, এফ, ডি বানাবার যে হিড়িক দেখা যায় তাতে সামগ্রিক প্রশাসনযন্ত্রে শৈথিল্য দেখা না দিয়ে পারে না। যে অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই, দৈবক্রমে তা যদি নেহাত ঘটেই যেত তা হলে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি যা করতাম, উপরে তারই একটুখানি আভাস দেয়ার চেষ্টা করলাম মাত্র।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় স্মরণীয়। যে পাকিস্তানের সাক্ষাৎ ফলশ্রুতি বাংলাদেশ, সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা মুসলমানের দিক থেকেও কম আসে নি। এও বোধ করি অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশ আন্দোলনের তুলনায় পাকিস্তান আন্দোলন ছিল তীব্রতর আর ব্যাপকতর। ইতিহাসের বহু স্তর পার হয়েই একটা জাতি জাতি হয়ে উঠে। আমাদেরও পার হয়ে আসতে হয়েছে তেমন একাধিক স্তর। ইংরেজ আমল—পাকিস্তান আমল—বাংলাদেশ, এক একটি ধাপ, ক্রমপরিণতির দিকে এসব এক একটি পদক্ষেপ আমাদের। এর কোনটাই নিষ্কন্টক ছিল না, বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে সামনের দিকে। এ অগ্রগতির পথে গৃহশত্রুও কম ছিল না। ভিতর থেকেও বাধা কম আসে নি। কিন্তু এবারকার মতো প্রতিহিংসার এমন নগ্নরূপ আর কখনো দেখা যায় নি। পাকিস্তান—ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙ্গালী মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠা আর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের এক অসন্দিগ্ধ জাতীয় আন্দোলন ছিল। বহু বিশিষ্ট মুসলমান এ আন্দোলনের বিরোধীও যে ছিলেন, তাতেও সন্দেহ নেই। শেরে বাংলা ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন সত্য, কিন্তু পরে মুসলিম লীগের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরোধিতা করার জন্য তাঁকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছিল। ডাক্তার খাঁ সাহেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ছিলেন মনেপ্রাণে পাকিস্তানবিরোধী, গণভোটের সময় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রতিকূলে।

কুমিল্লার জনাব আশরাফ উদ্দীন চৌধুরীও ছিলেন কংগ্রেসী এবং পাকিস্তান বিরোধী। এ রকম অসংখ্য নজির উত্থাপন করা যায়। পাকিস্তান হাসিল হওয়ার পর কেউইত এঁদের দালাল বলে অভিহিত করে জেলে পাঠাবার কিংবা অন্য কোনরকম নির্যাতনের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে নি। বরং অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা আর যোগ্যতানুসারে এঁরা পাকিস্তানেও সম্মানের আসন পেয়েছেন। শেরে বাংলা বাংলাদেশের এডভোকেট-জেনারেল, মুখ্যমন্ত্রী, গভর্নর এবং কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন একের পর এক। এ সব কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। বিভিন্ন সময় তাঁর বিরুদ্ধে যে-সব ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে যে বারে বারে অপদস্ত করার চেষ্টা হয়েছে, তাও বৃহত্তর বাঙ্গালী-বিরোধী ষড়যন্ত্রেরই অংশ। পাকিস্তান বা জিন্নাহ-নেতৃত্বের বিরোধী ছিলেন বলে নয়। ডাক্তার খাঁ সাহেবও পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। আশরাফ উদ্দীন চৌধুরীও মন্ত্রী হয়েছিলেন একদা। কোথাও কোন আপত্তির কথা শোনা যায় নি।

এসব কথা চিন্তা করলে মনে প্রশ্ন জাগে: আমরা বাঙ্গালীরা কি দিন দিন অসহিষ্ণু, অনুদার, সংকীর্ণমনা আর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছি? সময়ের এ অল্প ব্যবধানে আমরা কি হৃদয়ের সব প্রশস্ততা হারিয়ে বসেছি? কি আশ্চর্য, আমরা নিজেদের মানুষকেও ক্ষমা করতে পারছি না। এ কোন মহৎ জাতির লক্ষণ নয়। প্রধানমন্ত্রী কি আমাদের মহত্বের পথে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হবেন? ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ—এ এক সর্বকালের সত্য।

———

স্বাধীনতা দিবসে দুটি প্রতিবেদন

স্বাধীনতার পর সব জাতির সামনেই অন্তহীন সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে যে অবস্থায় আমাদের স্বাধীনতা এসেছে, তাতে আমাদের সামনে বিচিত্রধর্মী সমস্যা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং তা সংখ্যায়ও বহু না হয়ে পারে না। একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত আমরা এক অখণ্ড পাকিস্তানের অংশ আর তার নাগরিক ছিলাম। যারা সেদিন আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, তারা এবং তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করে আমরা যারা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, এ দুই পক্ষই রাজনৈতিক অর্থে তখন পর্যন্ত একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও উভয় অংশের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক নয়, অন্য বহুবিধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল গত চব্বিশ বছরে। আর্থিক, বৈষয়িক ত ছিলই, সে সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের ছিটে-ফোঁটাও গড়ে উঠেছিল বই কি! দেশের রাজধানী ওখানে ছিল বলে এখানকার বহু মানুষকে জীবিকার অন্বেষণে ওখানে যেতে হয়েছে। সংখ্যানুপাতে কম হলেও ওখান থেকেও বহু লোক নিজেদের ভাগ্য নির্মাণের জন্য এসেছে এ অঞ্চলে। সরকারী চাকুরেদের আদান-প্রদান ত ছিলই। অধিকন্তু মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ভারতের পাকিস্তানবহির্ভূত নানা প্রদেশ থেকে বহু উর্দু ও গুজরাটিভাষী মুসলমানও এখানে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছিল। এমন কি অনেকে শুরু করেছিল স্থায়িভাবে বসবাস করতেও। এদের মধ্যে বিহার-বাসীর সংখ্যাই হয়তো বেশী। বাংলাদেশের নিকটতম আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশ বলে ওখান থেকে বেশী লোক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নেয়। তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাংলাদেশ থেকে

পশ্চিম পাকিস্তানে যারা গেছে তাদের অধিকাংশই সরকারী চাকুরে—শুনেছি সামরিক বিভাগে প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো বাঙালী রয়েছে। এদের সবাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অর্থাৎ ট্রেণ্ড। সরকারী নির্দেশ ছাড়া এদের কারো পক্ষে স্বস্থান ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ফলে এ সংকটের সময় যারা যে অঞ্চলে ছিল, তারা সে অঞ্চলে আটকা পড়েছে। দুই অঞ্চলের মধ্যে সংকট যে এমন আকার ধারণ করবে, তখন কেউই ভাবে নি। একই দেশের সৈন্যবাহিনী যে দেশের অন্য একটা অঞ্চলের উপর এমন একটা নির্মম আক্রমণ চালাতে পারে, সত্তরের ২৫শে মার্চের কালরাত্রির আগে কারো কল্পনায়ও তা স্থান পায় নি। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এমন অবস্থার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তারা প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল, একটা সমঝোতা হবেই। শেষ পর্যন্ত না হওয়ার জন্য পুরোপুরি দায়ী পাকিস্তানের সামরিক জান্তা। যার প্রধান স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট এহিয়া খাঁ আর পশ্চিম পাকিস্তানী কতিপয় অদূরদর্শী রাজনীতিবিদ, যাদের নায়ক জুলফিকার আলী ভুট্টো যিনি এহিয়াকে সরিয়ে এখন দখল করে বসেছেন প্রেসিডেণ্টের গদি। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সৃষ্ট এ সংকট স্রেফ সংকট হলে তার সমাধানের একটা পথ নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যেতো। কিন্তু সংকটের সঙ্গে সঙ্গে যে সশস্ত্র আক্রমণ আর অমানুষিক নির্যাতন তারা বাংলাদেশের বুকের উপর চালাতে শুরু করলো তহাতার থেকে পরিত্রাণের জন্য পাল্টা আক্রমণ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না এ দেশের মানুষের সামনে। এ আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণ অচিরে এমন এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রূপ নিলো যে তার থেকে পিছানোর কোন উপায় কোন পক্ষেরই ছিল না সেদিন। বাঙালীদের পক্ষে পিছানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তখন তাহাদের জন্য তা হয়ে উঠেছে জীবন-মরণ সমস্যা—স্বাধীনতা বনাম চিরগোলামি। তাই বাঙালীর জন্য এ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে দাঁড়ায় স্বাধীনতার সংগ্রাম। চূড়ান্ত সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত বাঙালী জয়ী হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানকে বরণ করে নিতে হয়েছে সার্বিক পরাজয়। এ জয়-পরাজয়ের পর যেসব অনিবার্য সমস্যা দেখা দিয়েছে এখন সর্বাগ্রে তারই সমাধানে আমাদের

রাষ্ট্রকে করতে হবে আত্মনিয়োগ। এর মধ্যে প্রশাসনযন্ত্র অনেকখানি স্থিরতা লাভ করেছে। সাধারণ নির্বাচনের পর নতুন সরকারও হয়েছে গঠিত। এখন আমার বিশ্বাস, জাতি আর জাতীয় মানস অনেকখানি সুস্থির হতে আর সুস্থ-স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার পথ পেয়েছে খুঁজে। খুঁজে না পেলে খুঁজে নিতে হবে। স্বাধীনতাকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য এছাড়া অন্য উপায় নেই অর্থাৎ এখন থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় আর সামাজিক জীবনের সব কিছু চলা চাই স্বাভাবিক আর সুস্থতার পথে। সংগ্রামের দিনে উত্তেজনা-উদ্দীপনা, এমনকি বিদ্বেষেরও হয়তো প্রয়োজন ছিল। এখন ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছার পর নিঃসন্দেহে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন ক্ষমা, তিতিক্ষা, সংযম, সহিষ্ণুতা আর উদার মনোভঙ্গি যা মহৎ জাতির লক্ষণ, তা আয়ত্ত আর অনুশীলনেরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। সংগ্রামের দিনে জাতির দৃষ্টি থাকে বাইরের দিকে, বস্তুগত লাভ-লোকসানের প্রতি। সংগ্রামশেষে, বিশেষ করে বিজয়ের পর দৃষ্টিকে ফেরাতে হয় অন্তর্মুখী—তখন জাতিকে করতে হয় আত্মবিশ্লেষণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে এখন একদিকে যেমন পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে চালাতে হবে আত্মশুদ্ধির অভিযান, সন্ধান করতে হবে জাতীয় চরিত্রের সবলতা-দুর্বলতার। বিদ্বেষ বা নিপীড়নের পথে এ কখনো সম্ভব নয়। কিসে আমাদের মঙ্গল, কোথায় আমাদের শক্তি, তা খুঁজে বের করার সময় এসেছে আজ। সেপথে না গিয়ে, অত্যন্ত পরিতাপের কথা, আমরা যেন হতে চাচ্ছি নিষ্ঠুর দণ্ডধর বা দণ্ডদাতা। দণ্ড যে কোন মহৎ শক্তির প্রমাণ এ আমি বিশ্বাস করি না। দণ্ডে আইনের মুখ রক্ষা হয় সত্য এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রের সার্বিক স্বার্থ জড়িত, সেখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আমল না দিয়ে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং উচিত সেভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত সমস্যার বিচার করাও। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাই উদার ও মানবিক দূরদর্শিতা।

ইদানীং দু'টি সমস্যা আমাকে অহরহ পীড়া দিচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রে সুনির্দিষ্ট নীতি কি, তারও কোন কুলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। এ দুটি সমস্যাই মানবিক, যদিও সামরিক ঘটন তার কার্যকারণ আর প্রতিক্রিয়ারই এ ফলশ্রুতি। কিন্তু আমি মনে করি এখন সে-সব কিছুর চূড়ান্তভাবেই অবসান ঘটেছে। ফলে এখন সম্পূর্ণভাবে এ সমস্যা দু'টিও মানবিক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এবং বৃহত্তর বাংলাদেশের তথা বাঙ্গালীর স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত বলে এসবের আশু সমাধান অত্যাবশ্যক। এ দু'টি সমস্যার একটি হচ্ছে আটক বাঙ্গালী বনাম যুদ্ধবন্দী আর বাংলাদেশে অবস্থানকারী হতভাগ্য উর্দু'ভাষী সম্প্রদায়—প্রচলিত অর্থে যাদেরে বিহারী বলা হয়, যদিও এদের সবাই বিহার থেকে আসে নি। অনেকে এসেছে কলকাতা আর ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে। যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা তিরানব্বই হাজার আর আটক বাঙ্গালীর সংখ্যা নাকি চার লাখ। তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দীর বিচারের হুমকি দিয়ে আমরা কি না আজ চার লাখ বাঙ্গালীর ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি! এ কিছুমাত্র সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

'যুদ্ধবন্দীদের বিচার হবে, এখানেই হবে, বাংলাদেশের মাটিতেই হবে'—গত এক বছর কি তারো বেশী সময় থেকে এ ফাঁকা বুলি আমরা শুনে আসছি। এ অকারণ হুমকিতে যুদ্ধবন্দীদের কিংবা পাকিস্তানের কিছুমাত্র ক্ষতি হচ্ছে কি না জানি না; কিন্তু পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের দুর্দশা যে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এ প্রায় নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো ব্যাপার। যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দিয়ে আমরা যদি চার লাখ বাঙালীকে নিরাপদে ফেরত পাই, সেটাই কি আমাদের জন্য অধিকতর লাভজনক নয়? আমাদের নিকট, যে-কোন মা-বাপের কাছে তার একটি সন্তান অপরের তিরানব্বই হাজার সন্তানের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। আমাদের সহ, যে-কোন দেশের প্রধানমন্ত্রীর সামনে একশ'জন কি তারো বেশী যুদ্ধপরাধীকে হাজির করে যদি বলা হয়: আপনার একটা ছেলেকে যদি বলি দেওয়ার অনুমতি দেন, তাহলে আপনি একশ'জনকে এখনি

স্বহস্তে কতল করতে পারেন। কোন প্রধানমন্ত্রী কেন, দীনাতিদীন ভিখিরি, যে দিনান্তে সন্তানের মুখে এক মুঠো ভাত তুলে দিতে পারে না, সেও এমন প্রস্তাব ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করবে। যুদ্ধাপরাধের বিচার করার রেওয়াজ আছে সত্য, গত বিশ্বযুদ্ধের পরও তেমন বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তখন বিচারক রাষ্ট্রগুলির ঐ বিচারের ফলে কিছুমাত্র হারাবার কোন ভয় ছিল না, পরাজিত জার্মানদের হাতে এসব রাষ্ট্রের কোন নাগরিকই ছিল না আটক। তাই তারা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় নাজী যুদ্ধবন্দীদের বিচার করতে পেরেছে। আমাদের অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দীকে ফাঁসি দিলেও বাংলা-দেশের এক বিন্দু ফায়দাও হবে না। অধিকন্তু চার লাখ নিরপরাধ বাঙালীকে চিরতরে হারাবার আশঙ্কা দেখা দেবে তখন। অন্ততঃ তার ফলে ওদের দুর্ভোগ যে চরম আকার ধারণ করবে তাতে ত সন্দেহ নেই। এ চার লাখ মানুষ বাংলাদেশের পরম সম্পদ, এদের মধ্যে ট্রেণ্ড সামরিক বাহিনীর লোক যেমন রয়েছে, তেমনি অত্যন্ত সুদক্ষ অভিজ্ঞ প্রশাসকও রয়েছে অনেক! বিধ্বস্ত বাংলা-দেশের জন্য এদের সেবা অপরিহার্য। স্বাধীনতা ছাড়া অন্য যে-কোন কিছুর বিনিময়ে এদের ফিরিয়ে আনা উচিত। ভারতীয় নেতা আর রাজনীতিবিদরা আমাদের চেয়ে অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী, তাই তাঁরা ও যুদ্ধবন্দী বিনিময় করে নিজেদের ছেলেদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চিম ফ্রন্টেও যতটুকু দখল করতে পেরেছিল, তাতে নির্যাতন কম চলায়নি। তবুও ভারত ঐ ফ্রন্টের যুদ্ধবন্দীদের বিচারের হুমকি দেয়নি এ কারণে যে, তাদের কাছে তাঁদের নাগরিকদের জীবনের মূল্য অনেক বেশী। বলা বাহুল্য, পূর্ব ফ্রন্টে ভারত বিজয়ী, কাজেই এ ফ্রন্টে ভারতের কোন যুদ্ধবন্দী নেই। তাই এ ফ্রন্টের পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের সম্বন্ধে ভারত নির্বিকার, বাংলাদেশের বরাত দিয়েই সে খালাস। বাংলাদেশের বিজয় ভারতের জন্য এক চিরকালের বিজয়। দুই ফ্রন্টে সামাল দেওয়ার মাথাব্যথার চির-অবসান—তাই যুদ্ধবন্দীদের খাওয়া-পরার দায়টি ভারত সানন্দে বহন করছে।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতায় ভারতের কাছে আমরা শিশু, নাবালক ও অপরিণতবুদ্ধি। তাই নিজের চার লাখ সন্তানের মঙ্গলা-মঙ্গলের কথা না ভেবে আমরা পরের তিরানব্বই হাজার ছেলের নাক কাটার জন্য চেঁচামেচি করছি। বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধবন্দীদের বিচার মানে কয়েক কোটি না হলেও কয়েক লক্ষ টাকার অপচয়—দেশ পুনর্গঠনের জন্য, দেশের অগুনতি নিঃস্ব মানুষের খাওয়া-পরার জন্য যেখানে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন, সেখানে এ বিরাট অপচয়ের ঝুঁকি নেওয়া কি চরম নির্বুদ্ধিতা নয়? মানুষ যা কিছু খরচ করে, বিনিময়ে তার থেকে কিছু পেতে চায়—যুদ্ধবন্দীদের বিচারের খাতে যে বিপুল অর্থব্যয় হবে, তা বাংলাদেশের জন্য বা তার মানুষের জন্য কিছুমাত্র ফায়দা বহন করে আনবে না। ইংরেজিতে যাকে বলে এ এক unprofitable, unproductive বিনিয়োগ। স্রেফ লোকসান, লোকসান। রাষ্ট্রীয় ব্যপারে আর্থিক লোকসান হয়ত সওয়া যায়, কিন্তু দেশের পরম সম্পদ চার লাখ বাঙালী সন্তানকে হারাবার বা তাদের চরম দুর্ভোগের কারণ হওয়ার লোকসান কি করে সওয়া যাবে? তাই নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থ আর চার লাখ হতভাগ্য নিরপরাধ বাঙালীর ভাগ্যের দিকে নজর রেখে এ সমস্যার আশু সমাধান করে ফেলুন। দেশ আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

সামরিক বিভাগের কঠোর আইন কানুনের কথা সকলের জানা, এ কঠোর আইন-কানুনের ফলে সৈনিকরা হয়ে পড়ে হুকুমের দাস। এর উপর এদের জীবন-মরণ নির্ভর। এর ফলে সৈনিককে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অপরাধ করে যেতে হয়, করেও থাকে। প্রকৃত অপরাধী কিন্তু হুকুমদাতা—সৈন্যবাহিনীর অধিকর্তা বা প্রধান সেনাপতি। বাংলাদেশে সংগঠিত যতসব না রকীয় অপরাধের নায়করা কি এখন আমাদের নাগালের বাইরে। এঁরা খাঁ-টিক্কা খাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করারও জো নেই আমাদের। তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দী আর তাদের সহযোগী নিহতরা সবাই ধরতে গেলে ওদেরই ক্রীড়নক ছিল। কাজেই যুদ্ধ-

বন্দীদের এদিকটাও বিবেচনা করে দেখতে হবে। এটাও হয়ত আমাদের জন্ত খুব বড় বিবেচ্য নয়। আমাদের জন্ত সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বাংলাদেশের আর বাঙালীদের স্বার্থের কথা। এ ব্যাপারে আটক-পড়া চার লাখ বাঙালীর মঙ্গলামঙ্গলের কথা। ঐটিকে দিতে হবে সবার উপরে স্থান।

নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমার আর একটি নিবেদন: বিহারী তথা যেসব উর্দুভাষী বাংলাদেশে রয়ে গেছে, হয়তো রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, অচিরে এদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এটি একটি মানবিক-সমস্যা। এরা ইতিহাসের শিকার—পাকিস্তানের বলি। পাকিস্তান না হলে যেমন বাংলাদেশ হতো না, তেমনি পাকিস্তান না হলে এরাও স্বজন-স্বদেশ ছেড়ে বাংলাদেশে আসতো না। মরলে নিজের দেশেই মরতো। ইতিহাসের এ অনিবার্য ধারাকে এখন ভুলে যাওয়া অনুচিত। সত্য আর তথ্যকে বিকৃত করে ইতিহাস হয় না, তেমন চেষ্টা ইতিপূর্বে এখনো সফল হয় নি। সৈনিকদের মতো এদেরও অনেকে পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেক অন্যায় করেছে, তারাও বাঙালী নির্যাতন আর হত্যার যে কারণ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের বহু নেতা-উপনেতা যেমন ইতিহাসের ধারা বুঝতে ভুল করেছে, তেমনি এরাও ভুল করেছে এবং বিভ্রান্ত হয়েছে। ফলে বহু অমানুষিক ঘটনায় এরাও হয়েছে শরিক, অংশ নিয়েছে বাঙালী নির্যাতনে। এদের নেতা-উপনেতা আর দুষ্কর্মের নায়করা বাংলাদেশের বিজয় আসন্ন দেখে সরে পড়েছে। পাড়ি দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান। স্বাধীনতার পর কিছু হয়ত হয়েছে নিহত, আর কারারুদ্ধ হয়েছে কিছু সংখ্যক। এখন যারা বাইরে আছে, তারা একদম অসহায়, ছন্নছাড়া। এদের অধিকাংশই নারী আর শিশু। এদের কোন জীবিকা নেই, কোন পেশা কিংবা অবলম্বন নেই। সামনে কোন ভবিষ্যৎ এরা দেখতে পাচ্ছে না। এ এক অদ্ভুত করুণ অবস্থা। এদের সমস্যা সম্পূর্ণ মানবিক সমস্যা। জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় ছেঁড়া কাপড়-চোপড় আর অভুক্ত চেহারা নিয়ে এরা যখন রাস্তায় কি হাটে-বাজারে ভীত অসহায় হাত বাড়িয়ে দেয়, দিয়ে

কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ে, তখন এ দৃশ্য মানবতার প্রতি এক চরম ধিক্কার বলেই আমার মনে হয়। যার মনে কিছুমাত্র সংবেদনশীলতা রয়েছে তার পক্ষে এদৃশ্য অসহনীয়। আমার বিশ্বাস, আমার দেশ, বাংলাদেশের আদর্শ সভ্য, উন্নত আর মানবিক রাষ্ট্র হয়ে গড়ে ওঠার। প্রতিশোধ গ্রহণের দিন অপগত। লাঞ্ছিত মানবতার সামনে ভুলে যেতে হবে অতীতকে। অপরাধীকে বিচার করতে হয় বিচার করুন, দণ্ড দিতে হয় দণ্ড দিন, ফাঁসির অপরাধ করে থাকলে ফাঁসি দিন। আপত্তি নেই। কিন্তু যাদের এসব কিছুই করা হচ্ছে না, তাদের মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দিন, বাঁচতে দিন মানুষ হিসাবে। এ আদম সন্তানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন। যারা অন্যত্র যেতে চায়, তারা যাক। তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। ওদের বোঝা বয়ে বেড়াবার দরকার নেই আমাদের রাষ্ট্রের। যারা এখানে থাকতে চায়, এখানকার নাগরিকত্বে যাদের আগ্রহ, তাদের থাকার, সসম্মানে জীবিকা অর্জনের সুযোগ দেওয়া আমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের আবেদন জানাচ্ছি আমি নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি। শুধু বঙ্গবন্ধুতে আমি সন্তুষ্ট নই, আমি চাই আপনি হয়ে উঠুন মানববন্ধুও। ওর চেয়ে বড় সম্মান আর নেই।

লেখকের স্বাধীনতা

লেখকের স্বাধীনতা কথাটা এক হিসেবে স্ববিরোধী এবং আমাদের কাছে আজো কিছুটা বিপজ্জনক। স্ববিরোধী এ কারণে যে আসলে লেখে ত মন আর মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারই ত এক নাম চিন্তা, যা সব লেখার উৎস। সে চিন্তা অত্যন্ত ব্যক্তিক এবং সর্বতোভাবে নিজস্ব। তার উপর কোন রকম কর্তৃত্ব অচল। এ এক অতি প্রাচীন আর স্বীকৃত সত্য। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে একজন গ্রীক জ্ঞানী এ সত্যের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন এভাবে: 'মানুষের নিজস্ব বলতে একমাত্র জিনিস হচ্ছে মনের স্বাধীন চিন্তা।" কাজেই আমি মানুষও থাকবো আর স্বাধীন চিন্তাও বিসর্জন দেব—এক সঙ্গে তা হয় না। যেমন হয় না সাঁতারও কাটবো অথচ গা ভিজাবো না। এ স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে জীবনের বিকাশ আর মনুষ্যত্বের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কাজেই যে লেখকের মনুষ্যত্বে বিশ্বাস রয়েছে সে কিছুতেই কোন অবস্থাতেই চিন্তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে পারে না। দেওয়া মানে লেখক হিসেবে আত্মহত্যা করা।

বিপজ্জনক বলেছি এ কারণে যে—আমরা লেখকরাও কোন না কোন দেশের অধিবাসী, কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্রশক্তির একটি সাধারণ দুর্বলতা সন্দেহপ্রবণতা, বিশেষ করে মননশীল মানুষকে, সাধারণ অর্থে যাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয় তাদের সন্দেহের চোখে দেখা ক্ষমতার একটি স্বভাব। অর্থাৎ যারা লিখে থাকে, নিজের চিন্তাভাবনাকে, যারা প্রকাশ করে ভাষায় তাদের প্রতি কিছুটা অবিশ্বাসের চোখে তাকানো ক্ষমতার যেন এক সহজাত প্রবণতা। ক্ষমতার আর একটি দুর্বলতা সুযোগ পেলেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। দেখা গেছে অতি বড় সজ্জনও

যখন ক্ষমতার আসনে বসেন তখন মুহূর্তে তিনি হারিয়ে ফেলেন সব রকম পরিমিতিবোধ, তখন সীমা লঙ্ঘন হয়ে দাঁড়ায় তাঁর স্বভাব। এ কারণে জ্ঞানীরা সব সময় ক্ষমতা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন এবং কেউ কেউ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেছেন। এও দেখা যায় ক্ষমতা সব সময় ছাপার অক্ষরকেও যেন কিছুটা ভয় করে থাকে। ক্ষমতার এ মনোভাব প্রায়শঃ সরাসরিভাবে লেখকদের আঘাত হেনে বসে। নীরব কবির মতো নীরব লেখক কথাটাও অর্থহীন—যে নিজের চিন্তাভাবনাকে ভাষার রূপ দেয় না আর তা প্রকাশ করে না সে আর যাই হোক লেখক নয়। বোবার যেমন শত্রু নেই, তেমনি এমন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরও নেই কোন শত্রু, রাষ্ট্র এদের মনে করে অত্যন্ত ভালো মানুষ, অতি বশংবদ সৎ নাগরিক। এদের নিয়ে রাষ্ট্র নিশ্চিন্ত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীরা চান সারা দেশটা সমতার মরুভূমিতে পরিণত হোক—তাঁদের ভাষায় E. M. Forster-এর ভাষায় Desert of Uniformity সবুজের বৈচিত্র্য বা 'শতপুষ্পে' তাঁরা আতঙ্কিত।

ক্ষমতা যদি অপরিণতবুদ্ধি, অপরিপক্ব মানব আর অদূরদর্শীদের হাতে পড়ে তখন মননশীল লেখকদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় অধিকতর বিপজ্জনক। এ সব ক্ষমতাসীনদের সভ্যতা আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে থাকে না কিছুমাত্র স্বচ্ছ ধারণা—সভ্য সমাজ-জীবন গড়ে তুলতে কি কি বুনিয়াদি উপাদান অত্যাবশ্যক তা জানার আগ্রহ থেকেও এঁরা বঞ্চিত। ফলে মননশীলতার সব দরজা জানালা খুলে দিয়ে তাতে দক্ষিণ বায়ু প্রবেশের পথ করে দেওয়ার বদলে এরা বরং উল্টো দরজা জানালার আগে যেটুক ফাঁক ছিল তাও ঠেসে বন্ধ করে অর্গল লাগিয়ে দেন। মননশীল লেখকদের জন্য এ এক শ্বাসরুদ্ধ দশা। বর্তমানে আমাদের দেশের লেখকরা কেমন অবস্থায় বাস করছেন? আমাদের পদক্ষেপ এখন কোন দিকে? আমরা কি এখন নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন বোধ করতে পারছি?

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে কি দেখতে পাই? আমার বিশ্বাস লেখকদের পক্ষে এখন এ সব সঙ্গত প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার সময় এসেছে।

দীর্ঘকাল আমরা ইংরেজের অধীন ছিলাম। সে অধীনতার অবসান ঘটেছে ১৯৪৭-এর ১৪ই আগষ্ট। কিন্তু ইংরেজ আমলের যে অধীনতা বা বন্দীত্ব তা ছিল অনেকখানি বাহ্যিক বা দৈহিক—সে বন্দীত্ব আমাদের মন-মানসের উপর তেমন কোন প্রবল চাপ সৃষ্টি করে নি, রাজনীতির বাইরে তার শাসন ছিল অত্যন্ত শিথিল। ফলে বাংলা সাহিত্যে সব খ্যাতনামা লেখক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কারক আর হিন্দুসমাজে সীমিতভাবে হলেও যাঁরা রেনেসাঁস এনেছিলেন তাঁদের সবারই আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে সে যুগে। এমন কি আমাদের বিদ্রোহী কবিরও আবির্ভাব তখন। আর তখন লেখকরা অনায়াসে বেপরোয়া হতে পারতেন। শরৎচন্দ্র এবং আরো অনেকে তার উজ্জল দৃষ্টান্ত। বেপরোয়া হতে না পারলে লেখক নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। বেপরোওয়া হওয়া মানে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন বোধ করা।

পাকিস্তান আমলে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলো বটে কিন্তু তারপর থেকে শুরু হলো অন্যরকম বন্দীত্ব। এ বন্দীত্ব শুধু দৈহিক ছিল না, ছিল অনেকখানি মানসিকও। এ শেষোক্ত বন্দীত্বই আমাদের জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল সব চেয়ে মারাত্মক। মানুষের চিন্তা-ভাবনার একমাত্র বাহন আর প্রকাশ-মাধ্যম তার মাতৃভাষা, আমাদের সে মাতৃভাষার উপরই তখন যে শুধু হামলা শুরু হলো তা নয়, নানা রকম বিধিনিষেধের দড়াদড়ি দিয়ে আমাদের সামনে বিষয়বস্তুকেও ক'রে দেওয়া হলো সংকীর্ণ—আমাদের কল্পনার পায়ে বেড়ি পরাবার চেষ্টা চল্লো অনবরত। তখন এ সংকীর্ণতার আবর্তে ঢুকে মরা ছাড়া আমাদের আর কোন গতি রইল না। কল্পনার অবাধ হতে না পারলে লেখক কিছুতেই লেখক হতে পারেন না। সেদিন আমরা লেখকরা কেউই সত্যিকার অর্থে বেঁচে ছিলাম না। আমাদের চিন্তা ভাবনাই আমাদের প্রাণ, আমাদের জীবন—সে চিন্তাভাবনাকে আমাদের পদে পদে গলা টিপে হত্যা করতে হয়েছে। যে কথাটা বোরিস-প্যাস্টারনেক তাঁর ডক্টর জিভাগো উপন্যাসে বলেছেন "...there is only one thing they really want : you should hate what you like and love

what you abhor !" তুমি যা ভালোবাস তাকে ঘৃণা করো আর যা তোমার কাছে ঘৃণ্য তাকেই কি না তোমাকে বাসতে হবে ভালো। পাকিস্তানের চব্বিশ বছর আমাদেরও তাই করতে হয়েছে। যে শাসক আর শাসনকে আমরা মনে-প্রাণে ঘৃণা করতাম অনবরত তারই জিন্দাবাদ দিতে হয়েছে আমাদের লেখকদেরও আর যে ভাষা যে দেশ আর জাতীয়তাকে আমরা অন্তর দিয়ে ভালবাসতাম প্রচার করতে হয়েছে অনবরত তারই নিন্দা। এমন অবস্থা দীর্ঘকাল চলে যে-কোন জাতির মানসিক পঙ্গুত্ব অনিবার্য। সুখের বিষয়, মাত্র চব্বিশ বছরে আমরা এ দুঃসহ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

এখন আমাদের আর একটি নতুন যুগের শুরু, এখন পা বাড়িয়েছি আমরা নতুন ইতিহাসের দিকে। বলা যায় এখন আমরা পুরোপুরি স্বাধীন—সব রকম বৈদেশিক ও বিজাতীয় প্রভাব-মুক্ত। আমরা যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি, যে রাজনৈতিক দলকে আমরা লেখকরাও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছিলাম, পরিণামে সে রাজনৈতিক দল বিজয়ী হয়েছে, যে সরকার আমরা মনে-প্রাণে কামনা করেছিলাম সে সরকারও আমাদের হয়েছে। তবুও আমরা লেখকরা কি পুরোপুরি নিজেদের স্বাধীন বোধ করতে পারছি? আমাদের মনের কথা কি পারছি মনের মতো করে প্রকাশ করতে? লেখা মানে প্রকাশ করা, প্রকাশ ছাড়া লেখার এক কানাকড়ি মূল্যও নেই। লেখা প্রকাশের সব অন্তরায় কি বাংলাদেশের লেখকদের সামনে থেকে দূর হয়েছে এখন? এ প্রশ্নের 'হাঁ' উত্তর দিতে পারলে সব চেয়ে খুশী হতাম আমি নিজে। কারণ আমিও ত কায়মনোবাক্যে এ সরকারকেই চেয়েছিলাম। কথাটা আর একটু খোলাসা করা যাক। আজকের দিনে লেখকের স্বাধীনতার সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লেখকের চিন্তা-ভাবনা আর বক্তব্যকে বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সর্ব প্রধান বাহন দেশের পত্র-পত্রিকা। স্বাধীনতার পর অবস্থার নানা হেরফেরে জাতীয় পত্রিকার বৃহত্তর অংশের উপর একভাবে না একভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারী কর্তৃত্ব। বড় বড় সব পত্রিকার প্রশাসক, পরি-

চালক, সম্পাদক ইত্যাদি সব গুরুত্বপূর্ণ পদে সরকার মনোনীতরাই হয়েছেন নিযুক্ত। ইতঃপূর্বে এমন কাণ্ড কখনো ঘটে নি।

এভাবে বিভিন্ন পদে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন বা রয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা সবাই হয়তো সজ্জন, যোগ্য এবং দেশপ্রেমিকও কিন্তু যে পদের সঙ্গে নিজের আর পরিবার পরিজনের জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে, সে পদ আঁকড়ে থেকে তাঁরা ত কোন রকম ঝুঁকি নিতে পারেন না, ইচ্ছা থাকলেও পারেন না। তেমন আশা করাও হয়তো অন্যায়। যে দেশে বুদ্ধিজীবীর জীবিকার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ সেখানে অবস্থা এ না হয়ে যায় না। জীবিকা হারাবার ভয়ে সব সময় তাঁদের থাকতে হয় সন্ত্রস্ত। ফলে সরকারের মুখের দিকে চেয়েই তাঁদের লিখতে হয় এবং লেখা ছাপতে হয়। সরকার ত একজন নন—প্রধানমন্ত্রী কিংবা শুধু রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়েইত কোন সরকার নয়। এঁরা ছাড়া সরকারের বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে—যেমন, মন্ত্রীমণ্ডলী, মন্ত্রণালয়ের সচিব, গণপরিষদ সদস্য, যে পার্টি ক্ষমতায় রয়েছেন তার বিভিন্ন স্তরের নেতা উপনেতারা রয়েছেন, সে সঙ্গে সংগঠন কর্তারাও আছেন—কোন্ লেখায় এঁদের কার কখন বিরাগ-ভাজন হতে হয়, সাংবাদিকদের এখন অহরহ সে ভেবেই থাকতে হয় তটস্থ। লেখা প্রকাশের বেলায় তাঁদের সামনে সে বিবেচনাটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। লেখার গুণাগুণ নয়, লেখকের বক্তব্য সরকারী মহলে কি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে দুর্ভাবনাই হয়ে দাঁড়ায় এখন তাঁদের সব চেয়ে বড় মাথাব্যথা। ফলে এ ভয়ের চোটে বহু নিরীহ লেখাও তাঁরা ছাপতে পারেন না, ছাপেন না। আমি ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতা নিয়েই এ কথা বলছি।

চিন্তার স্বাধীনতা মানে লেখকের স্বাধীনতা, লেখকের স্বাধীনতা মানে প্রকাশের স্বাধীনতা। হিটলারও চিন্তার স্বাধীনতা রোধ করতে চেয়েছিলেন, পারেন নি, সাময়িকভাবে প্রকাশের স্বাধীনতা রোধ করেছিলেন বটে। কিন্তু জার্মেনীর সে দুঃস্বপ্নের কাল কেটে যেতে খুব বেশী দেরি লাগে নি। ইতিহাসকে ভুলে থাকা হলেও ইতিহাস কাকেও ভোলে না। সব দেশের ক্ষমতাসীনদের উচিত ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করা।

হিটলারের পরিণতির সঙ্গে আয়ুব-এহিয়া-মোনেমের পরিণতির কি কিছু-মাত্র সাদৃশ্য নেই? লেখা আর লেখকের একটি বড় ধর্ম পাঠককে সচেতন করে তোলা, পাঠক-মনে সর্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা সঞ্চারিত করা। এ সচেতনতা আর জিজ্ঞাসাকে যে সমাজ বা রাষ্ট্র ভয় করে, সে সমাজ বা রাষ্ট্র নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনে। লেখকের স্বাধীনতা হরণ করা মানে একটা জাতিকে অপরিণত-বুদ্ধি তথা না-বালেগ করে রেখে দেওয়া। নির্বিচারে শাসন-ক্ষমতা চালাবার জন্য এটি একটি মোক্ষম উপায় মনে করা হয় বটে কিন্তু সমৃদ্ধ, উন্নত আর শক্তিশালী জাতিগঠনের পথ এটি নয়। অপরিণত-বুদ্ধি নাবালেগ মানুষকে দিয়ে একটা দাস জাতি গড়া যায় সত্য কিন্তু মহৎ জাতি গড়া যায় না। অবাধ আলো হাওয়া না পেলে গাছ যেমন বড় আর শক্ত হয় না তেমনি মানুষ আর দেশও বিশ্বজ্ঞান আর মুক্ত চিন্তার স্পর্শ না পেলে বড় আর শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠে না। মানুষ মনোজীবী প্রাণী বলে তার বেলায় এটা আরো বেশী করে সত্য।

রাষ্ট্র সব সময় আনুগত্যের উপর জোর দিয়ে থাকে। ভালো কথা। কিন্তু তার আগে রাষ্ট্রকে আনুগত্যের কি অধিকারী হতে হয় না? যথার্থ অধিকারী হলে, আনুগত্য স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে পারে না। নিঃসন্দেহে আমি আমার দেশ, রাষ্ট্র আর সরকারের প্রতি অনুগত কিন্তু তাই বলে আমি অন্ধ আনুগত্যের পক্ষপাতী নই। আমার আনুগত্য চক্ষুষ্মানের আনুগত্য। আমি আমার রাষ্ট্রের প্রতি তাকাতেই চাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। আমি অনুগত নাগরিক বলেই এ জিজ্ঞাসা আমার জন্য অপরিহার্য। যে সরকার বা রাষ্ট্রের আমি অনুগত নাগরিক, সে সরকার বা রাষ্ট্র আমার আনুগত্যের অধিকারী কি না, আমার আনুগত্যের যথার্থ হক্‌দার কি না তা জানার অধিকার আমার রয়েছে। আমার মানে সমস্ত নাগরিকের। নাগরিকদের এটি একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। আমরা লেখকরা একই সঙ্গে সরকারের সমর্থক আবার সরকারবিরোধীও। সরকার যখন জনগণের কল্যাণের পথের অনুসারী তখন আমরা সরকারের পক্ষে, সরকার যখন জনস্বার্থের বিরোধী তখন আমরাও সরকারবিরোধী।

সরকারবিরোধী হওয়া মানে দেশের বিরোধী বা দেশের শত্রু হওয়া নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি বলেছেন: To differ from the state does not imply an absence of patriotism and that possibility of making such difference effective is the main safeguard we have against servility in society which the state controls. ......In this way Reason has a chance of victory in human affairs. In alternative lies a slavery both intellectual and moral.

জাতিকে নৈতিক আর মন-মানসের দাসত্ব থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব লেখক আর বুদ্ধিজীবীদের। বাংলাদেশের মহৎ লেখকরা সব সময় এ দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল আজো আমাদের সামনে এ বিষয়ে মূর্তিমান আদর্শ! তাঁদের সে আদর্শ আর দায়িত্ব এখন আমরা যারা বেঁচে আছি আর যাঁরা সামনে আসছেন তাঁদের কাঁধের উপর এসে পড়েছে। লাস্কি এও বলেছেন: The power, in short, call the state to account, is essential to freedom. কাজেই বহু ত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তাকে রক্ষা করে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য রাষ্ট্রের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে আমরা বাধ্য। তা না হলে লেখক হিসেবে আমাদের কর্তব্য-চ্যুতি, স্বধর্মচ্যুতি ঘটবে। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র পরিচালকরা আর যাকেই ফাঁকি দিতে বা বোকা বানাতে পারে না কেন লেখক বা বা বুদ্ধিজীবীদের পারে না। লেখকরা একটি তৃতীয় নেত্রের অধিকারী—যে চোখ দিয়ে তারা সব কিছু দেখতে পায়। তাই তাদের ক্ষমতার এত ভয়। এ ভয়ের নগ্ন রূপ আমরা পাকিস্তানী আমলে বেশ ভালো করেই দেখেছি। শাসকরা ভালো করেই জানে স্বাধীনতা আর সংগ্রামের, বিদ্রোহ আর প্রতিরোধের বীজ লেখকদের কলমের মুখ থেকেই নিঃসৃত হয়--সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তাই তাদের সব চেয়ে বড় আক্রোশ লেখকদের উপর। পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে পাক হানাদার বাহিনী লেখক আর বুদ্ধিজীবীদের তালিকা বানিয়ে খুঁজে খুঁজে যে হত্যা করেছে তা মোটেই অকারণ

নয়। তারা দেখেছে বাংলাদেশে যত আন্দোলন হয়েছে তার পেছনে ভাবগত প্রেরণা জুগিয়েছে লেখকরাই সব সময়।

কলম কথা বলে না সত্য, কিন্তু কলম সব সময় মুখর। কলমের এ মর্যাদা রাখার দায়িত্ব লেখকদের। চারদিকে যদি অন্যায়, অবিচার, মিথ্যা আর অনাচার লেখক দেখতে থাকে, তখন কি তাঁর পক্ষে চোখ বুজে থাকা সম্ভব? প্রতিবাদ তাঁকে জানাতেই হয়, অসত্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেই হয় তাঁকে। দুঃখের বিষয় প্রতিবাদী লেখা ত বটেই এমন কি সাধারণ লেখা প্রকাশের পথেও আজো যথেষ্ট বাধা রয়েছে আমাদের সামনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও এখন আর আগের মতো স্বাধীন নয়। সামরিক শাসনের আগে এঁরা অনেক বেশী স্বাধীন ছিলেন। আমাদের কোন কোন প্রতিভাবান লেখক সরকারী কর্মে নিযুক্ত, বিশেষত শিক্ষাবিভাগে—সরকারের অনুমতি ছাড়া এঁদেরও নাকি কোন রকম লেখা প্রকাশের অধিকার নেই। পরাধীনতা কিম্বা পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকতার যুগে লেখকদের সামনে যে বাধা ছিল আজো তা রেখে দেওয়া বা নতুন করে আরোপ করার কোন মানে হয় না। নিঃসন্দেহে সাহিত্যের অগ্রগতির পথে এ সব প্রবল অন্তরায়। এসব বিধিনিষেধ একারণেও অর্থহীন যে এ থেকে সরকার বা জনগণ কারো কিছুমাত্র ফায়দা হয় না। অথচ অকারণে এ নিষেধ খড়্গের মতো সরকারী চাকরিতে কর্মরত লেখকদের মাথার উপর ঝুলতে থাকে। নিছক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের ডিক্লেয়ারেশন পেতেও নাকি এখন চূড়ান্ত হয়রানি ভোগ করতে হয়। একদিকে সংবাদপত্রের উপর কর্তৃত্ব, অন্যদিকে এসব বাধা-নিষেধ, বহু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডিক্লেয়ারেশন নাকি পাওয়াই যায় না। ফলে বাংলাদেশের সম্পাদক আর লেখকরা এখন আর কোন রকম ঝুঁকি নিতেই চান না। অথচ ঝুঁকি না নিলে অন্যায়ের প্রতিকার সম্ভব নয়।

আয়ুবীয় সামরিক শাসনের সূচনায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নামে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে ই. এম. ফরস্টারের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম, আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে আবারও সে কথাগুলি

স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ করছি। ফরষ্টার বলেছিলেন: "তিনটি কারণে আমি লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। প্রথমত লেখককে নিজে বোধ করতে হবে তিনি পুরোপুরি স্বাধীন, তা না হলে সৃষ্টির জন্ম ভালো কিছু রচনার প্রেরণাই তিনি পাবেন না। তিনি যদি নির্ভয় হতে পারেন, মনে মনে আত্মস্থ হতে পারেন, সহজ হতে পারেন ভিতরে ভিতরে, একমাত্র তখনই তিনি পাবেন সৃজনশীলতার অনুকূল পরিবেশ। দ্বিতীয়তঃ, লেখক শুধু নিজে স্বাধীন এ বোধ করলে চলবে না, স্বাধীনতা হলো লেখকের জন্য প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু সে সঙ্গে আরো কিছু চাই। লেখক যা ভাবছেন অন্যকে তা বলার স্বাধীনতাও তাঁর থাকা চাই। তা না হলে তাঁর অবস্থা হবে বদ্ধমুখ বোতলের মতো। লেখক শূন্যে বিহার করতে পারেন না।—শ্রোতা বা পাঠক না হলে তাঁর চলে না। প্রকাশের পথে অন্তরায় থাকলে তিনি একদিন অনুভব করতেই ভুলে যাবেন। অনেক সময় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সরকারী কর্মকর্তারাও এ সত্যটা বুঝতে পারেন না বুঝতে চান না। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা ভালো কিছু সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের যদি সব রকম লেখা-পড়ার স্বাধীনতা না থাকে, লেখকের চিন্তা আর অনুভূতিকে যদি তাঁরা গ্রহণ করতে অক্ষম হন বা বাধা পান তা হলে তাঁদের নিজের চিন্তাশক্তি এবং অনুভূতিও চাপা পড়ে যাবে। ফলে তারা থেকে যাবে অপরিণত অর্থাৎ "Immature"। কাজেই লেখকের স্বাধীনতা যে শুধু লেখকের জন্যই প্রয়োজন তা নয়, জনসাধারণের বুদ্ধি আর মানস বিকাশের জন্যও তা অত্যাবশ্যক।" সুখের বিষয়, দেশের সংবিধান রচিত আর অনুমোদিত হয়েছে। আশা করা যায় এ সংবিধানে লেখকদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃতি পেয়েছে। অবশ্য সংবিধানে স্বীকৃতি পাওয়া তেমন বড় কথা নয়, বড় কথা বাস্তবায়ন অর্থাৎ বাস্তবে স্বীকৃতি। এর আগেও জনগণের বিভিন্ন অধিকারের শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতির কথা আমরা বহুবার সরকারী অমাত্যদের মুখে শুনেছি। কিন্তু জীবনে তা কখনো বাস্তবায়িত হয় নি। ফলে জনগণের অবস্থা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। সে সঙ্গে জনমনে বার বার জেগে উঠেছে অসন্তোষও। রাজ-

নৈতিক সুবিধাবাদীদের চক্রান্তে এবারও যেন তেমন না ঘটে। লেখকদের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা যেন স্রেফ কাগজে-কলমে নয় বাস্তব জীবনেও লাভ করে স্বীকৃতি। সরকারের মনে রাখা উচিত, সমালোচনা গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ। গণতন্ত্র আর সমালোচনা হাত ধরাধরি করেই চলে। সমালোচনা থেকেই রাষ্ট্র খুঁজে পায় সঠিক পথের দিশা। সমালোচনা ছাড়া কোন সরকারই সুস্থ ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে না। হাঁ-হজুরেরা কোন রাষ্ট্রেরই নির্ভরযোগ্য শক্তি নয়। লাস্‌কি যাকে healthy experience of criticism বলেছেন তা লেখকের জন্য যেমন তেমন রাষ্ট্রের জন্যও স্বাস্থ্যপ্রদ। ঐ না হলে রাষ্ট্র কখনো সঠিক পথ, সুস্থতা আর স্বাস্থ্যের পথ খুঁজে পায় না। লেখকদের দায়িত্ব সে পথ দেখানো। লেখক হাঁ-হজুর হতে গেলে বলেছি স্বধর্মচ্যুতি ঘটে। আমাদের দেশে তেমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবুও আমি বলবো এহ্ বাহ্য। খাঁটি লেখক কখনো হাঁ-হজুরের ভূমিকায় নামতে পারে না। রাজনৈতিক মুক্তির চেয়েও মনের মুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি অনেক মূল্যবান। ঐ ছাড়া স্বাধীনতা কখনো অর্থপূর্ণ হয় না। স্বাধীন চিন্তা ছাড়া শুধু যে আমাদের বুদ্ধি সংকীর্ণ হয়ে থাকবে তা নয়, দেশের মানুষের মনুষ্যত্বেরও ঘটবে না যথাযথ বিকাশ, জ্ঞানের চর্চা হয়ে থাকবে রুদ্ধ, মন হয়ে থাকবে দুর্বল। দুর্বলচিত্ত মানুষের স্বভাব সত্য-মিথ্যা নানা সংস্কারের শিকলে বাঁধা পড়া। তেমন অবস্থায় ভিতরে-বাইরে অধীনতার সমস্ত বন্ধন ছেদন করে সব রকম অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহসটুকুও আমরা হারিয়ে বসবো। তাই লেখার স্বাধীনতা, লেখকের স্বাধীনতা আমাদের যে-কোন মূল্যে অক্ষুণ্ণই রাখতে হবে। সংবাদপত্র আর সাংবাদিকদের পুরোপুরি স্বাধীনতা বাস্তব-ক্ষেত্রে যেন স্বীকৃতিলাভ করে আর তা যেন হয়

শিবির। সরকারী বা বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত লেখকদের কেন যে সরকারী দপ্তর বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে লেখা প্রকাশের জন্য অনুমতি নিতে হবে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমাদের দেশে যে-কোন নাটক অভিনয় করতে হলেও নাকি আই. বি. পুলিশের মঞ্জুরি প্রয়োজন হয় আজো। এ সবই লেখকের স্বাধীনতার পরিপন্থী। এ সব অচিরে বাতিল হওয়া উচিত। আইনের খেলাপ কিছু লেখা বা বলা কিংবা অভিনয় করা হলে প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত আইনেই ত রয়েছে। যে-সব বিধিনিষেধের কথা উপরে উল্লেখ করলাম তা সাহিত্য-শিল্পের অবাধ বিকাশের পথে অন্তরায় বলেই আমরা সে সবের আশু অবসান কামনা করছি।

আর একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। কোন বিশেষ দল বা কোন বিশেষ সরকারের প্রতি আমাদের আনুগত্য নয়, আমাদের আনুগত্য দেশের মানুষের প্রতি, দেশের সাহিত্য আর সংস্কৃতির প্রতি। যে দল বা সরকার এসবের পক্ষে আমরা লেখকরাও তাঁদের স্বপক্ষে, যে দল বা সরকার এ সবের বিরোধী আমরাও তাঁদের বিরুদ্ধে। তখন আমাদের একমাত্র হাতিয়ার কলমের সাহায্যে আমরা তার প্রতিবাদ করবো। প্রয়োজন হলে সংগ্রাম করতেও দ্বিধা করবো না। লেখকরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তার মানে জনগণের ভালো-মন্দের সঙ্গে লেখকরা একাত্ম। জনগণের কল্যাণের সংগ্রাম লেখকদেরও সংগ্রাম। এ সংগ্রামের পথেই লেখকদের সৃজনশীলতার ঘটে বিকাশ। বিজ্ঞানী J. B. S. Haldan-এর ভাষায় "Creation change always arsises from struggle. Men don't become good by being kept in cotton wool, but by fighting difficulties & temptations." তাই সব কথার শেষ কথা লেখকের স্বাধীনতা লেখকের হাতেই।

সে স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে বাংলাদেশের এযুগের লেখকদের একদিকে যেমন জয় করতে হবে সব ভয় আর বাধাবিঘ্ন তেমনি অন্যদিকে জয় করতে হবে সরকারী-বেসরকারী সবরকম প্রলোভন। এ দুই জয়ের পথেই লেখকের স্বাধীনতা হবে সুনিশ্চিত।

স্বাধীনতা বনাম শুভবুদ্ধি

স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি অর্জন করেছি বহু রক্ত আর অশ্রুর বিনিময়ে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ সরকার হয়েছে গঠিত। বাঙ্গালীর দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা হয়েছে পূর্ণ ও চরিতার্থ। আশাতীত দ্রুত গতিতে আমরা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্যে পৌঁচিয়েছি। যে তিনটি লক্ষ্য আর আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের এবারকার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত এবং যার উপর ভিত্তি করে স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার গঠিত তার প্রথমটি সার্বিক গণতন্ত্র, দ্বিতীয়টি ধর্মনিরপেক্ষ তা, তৃতীয়টি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কিন্তু এসব রাতারাতি হওয়ার নয়, বিশেষ করে শেষ দুটিকে বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট সময়ের দরকার, দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা, দক্ষকর্মী আর যোগ্য নেতৃত্বের। তার চাইতেও বড় কথা। এসবের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শান্তি, শৃঙ্খলা আর নিরাপত্তা। নিরাপত্তা শুধু কোন এক বিশেষ শ্রেণী বা রাজনৈতিক দল ভুক্তের নয়—দলমত নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের। তা না হলে স্বাধীনতার যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হবে। এদেশের সমস্ত মানুষ, সর্ব শ্রেণীর নাগরিক যাতে শান্তি আর নিরাপদে বাস করতে পারে তা দেখার প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব সরকারের যেমন তেমনি যে রাজনৈতিক দল গণসমর্থনের ফলে আজ দেশ শাসনের অধিকার পেয়েছে সে দলে ও অর্থাৎ তার কর্মী আর নেতাদেরও। তা না হলে রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা যে শুধু জনপ্রিয়তা হারাবে তা নয়, অচিরেই হারাবে গণসমর্থন এবং সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিচালনাও তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে। বিরোধী দল কিছুটা

দায়িত্বহীন হলেও চলে কিন্তু সরকারী বা সরকার সমর্থক, দলের দায়িত্বহীন হওয়া চলে না—কারণ সরকার সর্ব সাধারণের প্রতিভূ, শুধু দলীয় মানুষের নয়, সর্বসাধারণের সার্বিক মঙ্গলের দায়িত্ব সরকারের। তাই সরকারকে সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ আর দায়িত্বশীল হতে হয়।

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। তা আমরা অর্জন করেছি। কিন্তু তার আনন্দের সাধ দল-মত নির্বিশেষ দেশের আপামর জনসাধারণ পাচ্ছে কিনা? না পেলে তার অন্তরায় কোথায় খুঁজে বের করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে কোন সংগ্রামে বা যুদ্ধে দেশের সকল মানুষ শরিক হয় না, শরিক হতে পারে না। এমনকি যারা সংগ্রাম ও যুদ্ধকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছে তাদের সকলের পক্ষেও সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশে সাড়ে সাত কোটি মানুষ বাস করে, তবুও এবারকার সর্বাত্মক সংগ্রামে মোটামুটি কয়েক লক্ষ লোকই সাক্ষাৎভাবে অংশ নিয়েছেন, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে কয়েক হাজার মাত্র। বাকি মানুষের শতকরা নব্বইজনেরও বেশী সংগ্রাম ও যুদ্ধের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। এবং এসব লোক কোন একটা বিশেষ দলের নয়, অনেক কোন দলভুক্ত নয়। পাকিস্তান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের মূল কারণ, দেশের মানুষের কাছ থেকে তারা কোন জনসমর্থন পায় নি। শুধু সৈন্য আর অস্ত্রের জোরে যুদ্ধ করা যায় না। পেছনে জনসমর্থন অত্যাবশ্যক। আমাদের গেরিলারা আর আমাদের মুক্তিবাহিনী জনগণের সর্বাত্মক সমর্থন শুধু নয়, সাহায্য সহায়তাও পেয়েছে সব রকমে। তা না হলে দেশের অভ্যন্তরে এসে তারা পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ আর খণ্ডযুদ্ধ চালিতে পারতো না। দেশের সাধারণ মানুষের এ নীরব অবদান ভুলে যাওয়ার নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি আমাদের অনেক ছেলে, অনেক ছাত্র ও নিষ্ঠাবান কর্মী গোপনে গেরিলা আর মুক্তিবাহিনীর লোকজনকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এদের অনেকে তথাকথিত 'বদর বাহিনীর' হাতে ধরা পড়ে অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছে। অনেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে নি,

ঐ জল্লাদদের হাতে নৃশংসভাবে হয়েছে নিহত। এসবই ইতিহাস, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। এরা যে সকলে আওয়ামী লীগ কিম্বা ন্যাপের সদস্য বা সমর্থক তা নয়, এদের অনেকে দল-নিরপেক্ষ কিন্তু দেশপ্রেমিক, এমন কি যাদের বাপ-চাচা মুসলিম লীগ করে বা এক সময় করতো তাদের ছেলেকেও আমি গেরিলা আর মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করতে দেখেছি।

এবারকার সংগ্রামে আওয়ামী লীগের প্রধান ভূমিকা ছিল এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু বৃহত্তর পরিধিতে এবারকার সংগ্রাম ছিল, সত্যিকার অর্থে সর্বদলীয় সংগ্রাম যাকে বলা যায় জনযুদ্ধ। এদেশের প্রায় সবমানুষ একভাবে না একভাবে এ সংগ্রামে হাত মিলিয়েছে, মন মিলিয়েছে, জুগিয়েছে অর্থ-সামর্থ্য।

স্বাধীনতার পর এ সর্বাত্মক আর সার্বিক দৃষ্টিতে দেশের দিকে আর দেশের মানুষের দিকে তাকাতে হবে – অ-সংকীর্ণ উদার আর সহনশীলতার দৃষ্টিতে তাকাতে হবে সব মানুষের প্রতি। যারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যায় নি তাদেরকে শত্রু ভাবলে মারাত্মক ভুল করা হবে। মনে রাখতে হবে সাত কোটি মানুষ কখনো দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে না আর ঐ ভাবে চলে যাওয়া মানে সমস্ত দেশ আর দেশের যাবতীয় সম্পদ পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী আর অবাঙালীবর্গীদের হাওলা করে দেওয়া। তেমনি মারাত্মক ভুল করা হবে যদি এখন বেআইনী ঘোষিত দলগুলির সব নেতা আর কর্মীকে নির্বিচারে শত্রু মনে করা হয়। এ করা হলে বর্বর পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীরই করা হবে অনুকরণ। ওরা যেমন আওয়ামী লীগ আর ন্যাপকে শুধু বেআইনী ঘোষণা করে ক্ষান্ত হয় নি, নির্বিচারে ঐ দুই দলের সদস্য আর সমর্থকদের গুলী করে মেরেছে, ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করেছে, ধনসম্পদ লুঠ করেছে, তেমন বর্বরতার পরিচয় যেন আমরা না দিই। বর্বরতার অত্যাচার আর অকথ্য জুলুমই যে ওদের আশু পতন ডেকে এনেছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমরা যদি আজ ক্ষমতা হাতে পেয়ে ওদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করি তা হলে আমাদেরও পতন অনিবার্য। আল্লাহ সব সহ্য করেন কিন্তু জুলুম সহ্য করেন না, কোরানে বহু জায়গায় জালেমের উপর লানৎ বর্ষিত হয়েছে।

শুভবুদ্ধি—৩

আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। কাজেই অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতো আমাদের দেশেও বহু রাজনৈতিক দল আছে এবং আগেও ছিল। এখন ধর্মভিত্তিক বা সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘোষণার আগে যারা এ সব দলের সদস্য বা সমর্থক ছিল এখন যদি নির্বিচারে তাদের সবাইকে অপরাধী মনে করা হয় তা হলেও ভয়ানক ভুল করা হবে এবং করা হবে অবিচার, যে অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমরা আজ স্বাধীন হয়েছি। এহিয়া খাঁ আর তাঁর সামরিক জান্টা যেমন আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করার পরও আওয়ামী লীগ কর্মী আর সমর্থকদের 'ডাইনী খোঁজা' করেছিল, আমরাও কি এখন তাই করবো? না—স্বাধীনতা আমাদের দিল-মনকে প্রশস্ত আর উদার করেছে, আমরা সহিষ্ণু আর ক্ষমাশীল হয়ে শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবো। তা না হলে দেশে অশান্তি লেগে থাকবে। আমাদের নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কিছুতেই স্থিতিশীল হতে পারবে না। আমি নিজে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ঘোর বিরোধী। এসম্পর্কে আমি বহু কড়া প্রবন্ধ লিখেছি ইতিপূর্বে। আমার আন্তরিক বিশ্বাস ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মিশালে শুধু যে রাজনীতির ক্ষতি হয় তা নয় ধর্মেরও ক্ষতি হয়, ধর্মের আসল উদ্দেশ্যই হয়ে যায় ব্যর্থ। তবুও আমি বলবো অতীতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যারা করেছে বা বেআইনী ঘোষিত ধর্মভিত্তিক বা সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সব সদস্য আর সমর্থক ছিল সবাই তারা মন্দ লোক নয় সবাই দুষ্কৃতিকারী বা অপরাধী নয়। বিশেষ করে মুসলিম লীগ অতি পুরানো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের বহু জননেতা আর কর্মী দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁদের অনেকে এখন বয়োবৃদ্ধ, রাজনীতি থেকে একরকম অবসর নিয়েছেন বলা যায়। তাঁরা দেশের বা নিজেদের গাঁ ও গ্রামের কোন উপকার করেন নি একথা বলাও ঠিক হবে না। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও অনেকে একদা মুসলীম লীগে ছিলেন এবং সেখানেই তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের হাতে

খড়ি। স্বয়ং মরহুম সোহরওয়ার্দী আর শেখ মুজিবর রহমানও প্রথম জীবনে মুসলিম লীগের নেতা আর কর্মী ছিলেন। এখন পরিবর্তিত পরিবেশে মুসলিম লীগ যখন বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে এখন থেকে কেউ যদি মুসলিম লীগ করে তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি অপরাধী হবেন। সে অবস্থায় আইনানুগ শাস্তি তাঁর প্রাপ্য। আমার আপত্তি ডাইনী শিকারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অতীতে মুসলিম লীগ করার জন্য এখন দণ্ড দেওয়ার আমি বিরোধী। তার মানে এ বয়সে অতীতে কেউ যদি দেশ আর মানুষের বিরুদ্ধে কোন দুষ্কর্ম করে থাকে তার শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে সে শাস্তি যথারীতি বিচার করে দেওয়া উচিত। জমা'ত ইসলাম বা নেজামে ইসলামে ভালো লোক নেই বা ছিল না বা ঐ দুই দলেরও সব সদস্য বা সমর্থকরা মন্দ লোক একথা বলা যায় না। আমার বিশ্বাস ঐ দু দ'লেও যথেষ্ট ভালো লোক আছেন এবং ছিলেনও। আমার বক্তব্য সব দলের অপরাধীদের খুঁজে বের করে বিচার করে শাস্তি দেওয়া হোক। নির্বিচারে কাকেও সে যে রাজনৈতিক দলেরই লোক হোক না যেন শাস্তি দেওয়া না হয়। মোটকথা শত অপরাধী মুক্তি পাক কিন্তু একজন নির্দোষীও যেন দণ্ডিত না হয়। সরকার আর জনগণের শুভবুদ্ধির কাছে আমার এটুকুই আবেদন।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

স্বাধীনতার পর আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গতি-প্রকৃতি আর তার রূপরেখা সম্বন্ধে দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনে স্বভাবতঃই নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে অর্থাৎ ১৯৭১-এর মার্চের আগে সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের যা অবস্থা ছিল স্বাধীনতার পর তার তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে কি না, যে পরিবর্তনকে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা যায় অগ্রগতি বলে—এটি আমাদের সামনে এখন এক বড় জিজ্ঞাসা।

স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়া আর পরিবেশ ছাড়া সংস্কৃতিচর্চা কখনো সার্থক হতে পারে না—এ এক সর্ববাদী আর সর্বস্বীকৃত সত্য। তাই দেখা যায়, যিনি একদিকে ক্ষমতার জোরে গোপন আদেশ জারি করে সংস্কৃতিসেবীদের স্বাধীনতা হরণ করেছেন, তিনিও অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য স্বাধীনতা যে অপরিহার্য তা প্রকাশ্যে অস্বীকার করার সাহস পাচ্ছেন না। ফলে অহরহ মাঠে-ময়দানে সর্বত্র সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার কথা তিনিও ঘোষণা করে থাকেন। এখন আমাদের জিজ্ঞাসা—১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশের সংস্কৃতিসেবীদের স্বাধীনতার দিগন্ত আগের তুলনায় সম্প্রসারিত হয়েছে, না হয়েছে অধিকতর সংকুচিত? সম্প্রসারিত হয়েছে বলতে পারলে সবচাইতে বেশী খুশী হতাম আমি নিজে। আপনারা জানেন, দীর্ঘকাল ধরে আমি এ স্বাধীনতার সপক্ষে লিখে এসেছি।

আমি একদা লিখেছিলাম—'পোষা বাঘ যেমন খাঁটি বাঘ নয়, তেমনি পোষা শিল্পীও খাঁটি শিল্পী নয়।' ব্যাঘ্রত্ব-হারিত, ব্যাঘ্রত্ব-বিসর্জিত বাঘকে দিয়ে যেমন সার্কাসের খেলা দেখানো যায় শুধু, তেমনি স্বাধীনতা বিসর্জিত বা ক্ষমতার কাছে বিক্রীত পোষা শিল্পীদের দিয়েও স্রেফ

শিল্পের এক রকম সার্কাসী ভূমিকা পালনই শুধু সম্ভব। অমন শিল্পীর অপমৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না।

স্বাধীনতা খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এতকাল আমরা স্বাধীনতা অর্থে স্রেফ রাজনৈতিক স্বাধীনতাই বুঝে এসেছি—সে সঙ্গে মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাও বলেছি বটে; কিন্তু সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার কথা আমরা কখনো উচ্চারণ করি নি, তার জন্য কোন আন্দোলনও গড়ে তুলি নি। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়তো তেমন কোন স্বচ্ছ ধারণাও ছিল না, হয়তো আমরা উপলব্ধি করতেই চাই নি এর গুরুত্ব। একটা জাতির পরিচয় তার সংস্কৃতিতে; কথাটা এভাবেও বলা যায়, একটা জাতিকে জাতি করে তোলে তার সংস্কৃতি—সংস্কৃতিতেই তার পরিচয় তার যা কিছু স্বাতন্ত্র্য আর বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বাইরের খোলস, সে স্বাধীনতা যদি মন-মানস আর প্রাণে সঞ্চারিত না হয় তাহলে তা কখনো হতে পারে না দৃঢ়-মূল সামগ্রিক আর জাতীয় দেহের সর্বস্তরে সম্প্রসারিত। দেহের চামড়ার মতো বাইরের খোলসেরও যে প্রয়োজন নেই তা নয়, তবে জীবন আর জীবনের সজীবতা, বিকাশ আর সমৃদ্ধি নির্ভর করে প্রাণের উপর। মাতৃদুগ্ধের মতো প্রাণরসের সঞ্জীবনী সুধা পান করেই জাতি মহৎ জাতি হয়ে ওঠে। এ প্রাণ-রসের আধার, ভাণ্ডার আর প্রস্রবণ সংস্কৃতিসাধনা সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ইত্যাদি কলাবিদ্যারই যৌথ নাম সংস্কৃতি। এ সবের যথাযথ সাধনা আর বিকাশে জাতির সাংস্কৃতিক জীবন হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ।

তবে সবকিছুর পেছনে একটা আদি আছে, রয়েছে মূল বা গোড়া —সংস্কৃতিচর্চারও আদি বা মূল গোড়া শিক্ষা। সে শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে আমরা রীতিমতো আতংকিত। এর ফলে শুধু সাহিত্য, শিল্প ও ললিতকলা নয়, জীবনের সব মূল্যবোধই ধূলায় মিশে যাচ্ছে। সব শিল্পীকেই যথার্থভাবে শিক্ষিত হতে হয়—শিক্ষিত হওয়া মানে দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে মনেপ্রাণে রুচিশীল আর চরিত্রবান হয়ে ওঠা। ইংরেজী ক্যারেকটার শব্দের অর্থেই আমি এখানে চরিত্র কথাটার ব্যবহার করছি। শিল্পীকে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের

অধিকারী হতে হয়। শিল্প-দক্ষতার মতো চরিত্র আর ব্যক্তিত্বও জন্মলব্ধ নয়—সাধনালব্ধ। সাধনায় যাদের অনীহা রয়েছে, তেমন সাধনাবিমুখদের কোন রকম শিল্পের আঙ্গিনায় অনধিকার প্রবেশ না করাই বাঞ্ছনীয়।

উদীচীর তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী বোধকরি প্রধানতঃ সঙ্গীতেরই সাধনা করে থাকে। সঙ্গীতকে বলা যায় ললিতকলার সর্বোত্তম অঙ্গ। এ কারণে বৈদিক যুগে সঙ্গীতকে বলা হতো 'দেবজনবিদ্যা'। এর থেকে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালেও ললিতকলা তথা সংগীতকে কতখানি উচ্চে স্থান দেয়া হতো। সঙ্গীত ছিল তখন সর্বসময়ের সাধনার বিদ্যা। এ সাধনাকে যাঁরা গ্রহণ করতেন, তাঁরা সারা জীবনের জন্যই তাকে বরণ করতেন। এখনকার মতো তখন সংগীত স্রেফ বিয়ে কিম্বা বেতার-টেলিভিশনে নির্বাচিত কিম্বা স্থান পাওয়ার পাসপোর্ট হিসেবে গণ্য হতো না। অর্থমোহ সবরকম ললিতকলার পরম শত্রু—এখন বেতার টেলিভিশন তরুণ শিল্পীদের সামনে তেমন একটা মোহজাল যে সৃষ্টি করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এর ফলে তরুণ সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের অনেকের একমাত্র মোক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে কোন রকমে বেতার-টেলিভিশনে স্থান পাওয়া, বেতার টেলিভিশন-শিল্পী হিসেবে পরিচিত হওয়া। এ মোক্ষলাভের পর সাধনা কিম্বা অগ্রগতির আর কোন তাগিদই বোধ করে না এদেশের শিল্পীরা। এভাবে শিল্পী নিজেই ডেকে আনে নিজের অপমৃত্যু।

আগের দিনেও শিল্পীদের জীবিকার সমস্যা যে ছিল না তা নয়। তখন রাজা-বাদশাহ-ভূস্বামী-নবাব আমিরেরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এখন সমাজ বিবর্তনের ফলে সে সামন্ত শ্রেণী নিশ্চিহ্ন। তাই শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব এসে পড়েছে এখন রাষ্ট্র আর সমাজের উপর। সমাজ আর রাষ্ট্র সে দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করছে'না বলেই বেতার-টেলিভিশনের দ্বারস্থ হতে শিল্পীরা একরকম বাধ্য হচ্ছেন অনেক সময় আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে। কারণ জীবনে জীবিকার চেয়ে বড় দাবী আর নেই। ললিতকলা আজ এক মহাসংকটের সম্মুখীন। যুগ আজ শুধু গতিশীল নয় বরং বলা যায় ধাবমান, তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ যন্ত্র আর যান্ত্রিকতা, তার দাবী তাৎক্ষণিকের, সে চায় অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে

সানাই। অথচ সবরকম ললিতকলা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার, কঠোর শ্রমসাপেক্ষ আর আজীবনের সাধনার বস্তু। নগদ বিদায় যেখানে সেখানে সবকিছু সস্তা আর নিম্নমানের না হয়ে যায় না। শিল্পীর জৈবিক প্রয়োজন আর শিল্পের মান রক্ষা—এ দু'য়ের সমস্যা আজ এক কঠিন সমস্যা। এ দুয়ের সমন্বয়ের অভাবে এখন কেউই পুরোপুরি সঙ্গীতজ্ঞ বা সঙ্গীতশিল্পী হতে পারছে না আমাদের দেশে। শিল্পীরা এখন জীবনের 'একভগ্নাংশই শুধু সঙ্গীতে কিম্বা অন্যান্য কলাশিল্পে নিয়োগ করতে পারেন, নিয়োগ করে থাকেন। এ অবস্থায় উন্নতমানের সংগীত আর সঙ্গীতশিল্পী আশা করা যায় না। এখন আমাদের দেশে সঙ্গীতের যে এক নিদারুণ অধোগতি দেখা যাচ্ছে তার কারণ বোধকরি এখানেই নিহিত। বলাবাহুল্য, শিল্প জীবনের সবটুকুই দাবী করে। সে দাবী আমাদের শিল্পীরা পূরণ করতে পারছেন না। যতদিন তা করা সম্ভব হবে না ততদিন শিল্প-সাধনায় আমাদের আশানুরূপ অগ্রগতিও আশা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আরো একটি মৌল বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মান যাই হোক আমাদের সঙ্গীতশিল্পীর অভাব নেই, তরুণদের অনেকে সঙ্গীত শিখছেন, সঙ্গীতশিল্পী হতে আগ্রহী। এ সবই আশার লক্ষণ। কিন্তু সঙ্গীত রচয়িতা বা কম্পোজার কই? নতুন নতুন সুরসমৃদ্ধ সঙ্গীত ত দেখা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না কোথাও। আর কতকাল আমরা চর্বিতচর্বণ করতে থাকবো? পুরানোকে ভাঙ্গিয়ে আর কতকাল চলবো আমরা? আমাদের সঙ্গীত-সম্পদ কি রবীন্দ্রনাথ নজরুল কিম্বা দ্বিজেন্দ্র-অতুল প্রসাদে সীমিত হয়ে থাকবে? আমাদের সমস্ত সঙ্গীত-প্রতিভা কি নজরুলে এসেই হয়ে থাকবে স্তব্ধ? সঙ্গীতে আমাদের সৃজনশীলতা কি একেবারে বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে? সৃজনশীলতার প্রাচুর্য ছাড়া ললিতকলার কোন শাখাই সামনে এগুতে পারে না। তখন ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে সুরপাক খাওয়াই হবে আমাদের ভাগ্য। এখন ত তাই করছি আমরা। ইদানীং একটি 'বিচিত্রা' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে অন্যটিতে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ সেখানেও একই সঙ্গীত কিংবা একই ধরনের নৃত্যের যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে, পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে তা সহজেই অনুমান

করে নেয়া যায়। আমাদের পূর্বসূরী বড় কবিরা প্রায় সকলেই প্রচুর সঙ্গীতও রচনা করেছেন। এ যুগের কবিদের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখ-যোগ্য সঙ্গীত-রচয়িতা বা কম্পোজারকে দেখা যাচ্ছে না। ফলে দিনে দিনে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে চলেছে আমাদের সঙ্গীতজগতে।

অন্য সবকিছুর মতো সৃজনশীলতা ছাড়া ললিতকলায়ও সমৃদ্ধি আসতে পারে না। এমন কি নৃত্যেও ইতিপূর্বে যারা নাম করেছেন তাঁরা তা করেছেন সৃজনশীলতার পথেই। মরহুম বুলবুল চৌধুরী ইতিহাস-পুরান এমন কি চলতি ঘটনাপ্রবাহ থেকেও উপাদান নিয়ে নতুন নতুন নৃত্য পরিকল্পনা করে নৃত্যশিল্পে প্রচুর বৈচিত্র্য এনে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তারপরে নৃত্যের নতুন পরিকল্পনায় কেউ হাত দিয়েছেন কি না আমার জানা নেই! উদয়শংকরও যে বিশ্বজোড়া নাম করেছিলেন সেও সৃজনশীলতার পথেই। রামায়ণ কাহিনীকে তিনি নতুন করে সৃজন করেছিলেন তাঁর নৃত্য পরিকল্পনার নতুন আঙ্গিকে। তাতেই চমকে উঠেছিল দর্শক 'অপুর সংসার' বা 'কাবুলী-ওয়ালা' এত ভালো চলচ্চিত্র হতে পারলো কি করে? সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা তার একমাত্র কারণ নয়। বড় কারণ পিছনে ছিল বিভূতিভূষণের সার্থক উপন্যাস 'পথের পাঁচালি' আর রবীন্দ্রনাথের 'অসামান্য গল্প'। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের গল্প-কাহিনী নিয়েই যে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্প একদিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই! অন্যান্য দেশের দিকে তাকালেও আমরা এ একই দৃশ্য দেখতে পাবো! আমাদের এখানে যে চলচিত্র শিল্প তেমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারছে না তার একটা বড় কারণ সার্থক গল্প-উপন্যাসের অভাব। বক্স বা অর্থ সাফল্যের দিকে নজর রেখে চলচ্চিত্রের উপযোগী গল্প যে বানানো যায় না তা নয়, কিন্তু তা কখনো শিরোত্তীর্ণ হতে পারে না। আমি বলতে চাচ্ছি—সব রকম শিল্পকারের পেছনে সৃজনশীলতা অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া কোন রকম শিল্প-সাধনাই বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। শিল্পীরা কণ্ঠ কি যন্ত্রসঙ্গীতের সাধনা করবেন—কিন্তু তার জন্য নতুন কথা

চাই নতুন সুর আর বক্তব্য চাই। শিল্পীরাও যুগের সন্তান,—সবরকম শিল্প ও যুগ-চেতনার বাহন। যুগের চাহিদা আর প্রয়োজন, জিজ্ঞাসা আর সমস্যার প্রতি তাঁরা উদাসীন থাকতে পারেন না। নতুন সৃজনশীল প্রতিভার প্রয়োজন একারণেও অপরিহার্য। আমাদের সব কথা আর আবেগে-অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথ কি নজরুল প্রকাশ করে নিঃশেষ করে গেছেন, এমন দাবি ঐ দুই মহাপ্রতিভার প্রতিও কিছুমাত্র শ্রদ্ধার পরিচায়ক নয়। আমাদের নিজেদের পক্ষে ত হীনমন্যতার চরম। এমন ধারণা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর— এও এক অচলায়তনে আটকে থাকা। সংস্কৃতির এক সহজাত ধর্ম অচলায়তনকে ভাঙ্গা, ডিঙ্গিয়ে যাওয়া, কোথাও আটকে না থাকা; আটকে না পড়া। তাই আমরা নতুন শিল্পী যেমন চাই, তেমনি চাই নতুন সঙ্গীত রচয়িতাও।

রাজনৈতিক অর্থে আমরা এখন পুরোপুরি স্বাধীন। কিন্তু এ স্বাধীনতা তেমন কোন জোয়ারের প্লাবন আনে নি আমাদের ভাবজীবনে, আমাদের কল্পনায়, আমাদের সংস্কৃতি সাধনায়। কোন জাতির জীবনে যখন জোয়ার আসে তখন তা সব দিকেই আসে। এ জোয়ার যদি ভাবজগতে কোন-প্লাবন না ঘটায় তা হ'লে তা নবজাগরণ তথা রেনেসাঁস হয়ে দেখা দেয় না। রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে মানস-জাগরণ তথা মননশীলতার ক্ষেত্রে নব নব দিগন্তের উন্মোচন না ঘটলে তা কখনো ফলপ্রসূ হয় না! এ কারণে আমাদের রাজনৈতিক জাগরণ বারে বারে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে। এবারও বিরাট এক রাজনৈতিক জাগরণ আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের উত্তরণ ঘটেছে। এসঙ্গে সাংস্কৃতিক জাগরণ যদি হাতে হাত না মিলায় তা হ'লে এ স্বাধীনতাও অচিরে অর্থহীন হয়ে পড়বে। মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না কথাটা পুরোনো হলেও সত্য। সংস্কৃতি হচ্ছে মনের খোরাক—এ খোরাকের সাহায্যে মন-মানসের বিকাশ আর সম্প্রসারণ ঘটে। সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য, অভিনয়, চিত্র আর সঙ্গীত এসবই সংস্কৃতির বুনিয়াদ। এসবের প্রভাবে ব্যক্তির শুধু নয়, সমগ্র জাতির মন আর চরিত্র সংহত আর পরিণত হয়, হয়ে ওঠে রুচিশীল আর

সুস্থ। রাজনীতি যেখানে মানুষকে করে ক্ষমতা-সচেতন, সংস্কৃতিচর্চা সেখানে মানুষকে করে মনুষ্যত্ব-সচেতন। তাই জাতীয় জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ সংস্কৃতিচর্চা।

সংস্কৃতিতে গণজীবনের প্রতিফলন শুধু ঘটে না, গণমানসের অভীপ্সা, এষণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন-কল্পনার প্রতিফলনও ঘটে তাতে। অর্থাৎ যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা সংস্কৃতিচর্চা নয়, যা হওয়া উচিত সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমকে হতে হবে তারও ইঙ্গিতবহ আর পথিকৃৎ। তাই বুর্জোয়া সমাজের সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চার রয়েছে বিরাট ব্যবধান। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি শুধু গণমুখী নয়, জীবনমুখীও। অর্থাৎ সর্বস্তরের জীবনের সঙ্গেই তার সম্পর্ক—তাতে ঘটে সব মানুষের জীবনের অভিব্যক্তি, তাতে রূপলাভ করে সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন-কল্পনা। এ কারণে মানুষের জীবিকার সঙ্গে, তার প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গের রয়েছে তার সম্পর্ক। এসবকে বাদ দিয়ে ওদের জীবনে সংস্কৃতিচর্চা স্রেফ বিলাস। এমনধারা বিলাসের স্থান নেই সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে। যেহেতু আমাদের আদর্শ সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, তখন আমাদের সংস্কৃতিচর্চার পরিধিকেও সেভাবে সম্প্রসারিত আর রূপায়িত করে তুলতে হবে। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীরও লক্ষ্য তাই হোক। জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির আয়ু প্রায় নিঃশেষিত। জনজীবন আর জনমানস যে সংস্কৃতিতে দক্ষতার সাথে, শিল্পসম্মতরূপে প্রতিফলিত সে সংস্কৃতিতেই ওরা পেয়ে থাকে একই সঙ্গে মনের খোরাক আর প্রচুর অনাবিল আনন্দ। এখন থেকে আমাদের সংস্কৃতিচর্চার লক্ষ্য তাই হোক।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

স্নেহভাজন সভাপতি ও সমবেত সাংবাদিক বন্ধুগণ! আজকে আপনাদের সামনে কিছু বলার সুযোগদানের জন্য সর্বাগ্রে আমি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন আমি সাংবাদিক নই। তবে সংবাদপত্র ছাড়া আমারও দিন চলে না। আমার কেন, অনেকেরই চলে না। অধিকন্তু লেখক ছাড়া সংবাদপত্র আর সংবাদপত্র ছাড়া লেখক চলতে পারে না। উভয়েই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। সেদিক দিয়েও লেখক আর সংবাদপত্রের তথা সাংবাদিকদের সঙ্গে আমাদের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সে সুবাদে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার হয়তো আমার আছে। সংবাদপত্র আজ সভ্য জীবনের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে। তাই বোধ করি এ যুগকে বলা হয় সংবাদপত্রের যুগ—দি এজ অফ নিউজ পেপারস। আবার কেউ সংবাদপত্রকে চতুর্থ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে অভিহিত করে থাকেন। এতে বুঝতে পারা যায়, সংবাদপত্রের ক্ষমতা আর গুরুত্ব সম্বন্ধে সবাই সচেতন। শ্রেণী হিসেবে সংবাদপত্রের স্থান চতুর্থ নির্দেশ করা হ'লেও, আমরা জানি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সব রাষ্ট্রই তথা রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতঙ্গ সংবাদপত্রের ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে। তাই একদিকে তাঁরা সংবাদপত্রকে রাখতে চান খুশী, অন্যদিকে রাখতে চান শাসনে, ফলে অনেক সময় সংবাদপত্রের মাথায় যুগপৎ বর্ষিত হতে থাকে তোষণ আর শাসন—যেটা যেখানে কাজে লাগে। এ অবস্থা ও নীতি শুধু সংবাদপত্রের পক্ষে নয় দেশ বা সমাজের জন্যও শুভ নয় মোটে।

বলা যায় সংবাদিকরাও সমাজ-জীবনের একরকম চিকিৎসক। যে রোগী চিকিৎসককে তার সব খবর জানাতে চায় না, দেয় না জানতে, তার যে দশা হওয়ার কথা- যে সমাজে সংবাদপত্র সব কথা খুলে বলতে পারে না, সে সমাজেরও অবিকল সে দশা না হয়ে যায় না। বলা

বাহুল্য, ব্যাধির কথা জানতে না চাওয়াও আর এক ব্যাধি। আর তা মনের ব্যাধি বলে দেহের ব্যধির চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর। ডাক্তারের যেমন রোগীর রোগ নির্ণয়ের পুরোপুরি স্বাধীনতা থাকা চাই, তেমনি সংবাদপত্রেও সংবাদ প্রকাশের আর সমাজদেহকে তন্ন তন্ন করে বিচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। এ না থাকলে শুধু যে সংবাদপত্র আর সাংবাদিকতা দুর্বল হয়ে পড়ে তা নয়, গোটা সমাজ আর জাতিও হয়ে পড়ে হীনবল, রক্তহীন ও ফ্যাকাশে। আজকের দিনে সংবাদপত্র শুধু সংবাদ পরিবেশন করে না, উচ্চমানের আর দায়িত্বশীল সব সংবাদপত্র এখন জাতির প্রতি-দিনের সমগ্র জীবনটাই তুলে ধরতে চায় পাঠকদের চোখের সামনে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জাতি কথা বলে, প্রকাশ করে নিজেকে। আজকের দিনে জাতির পরিচয় সংবাদপত্রই বহন করে, রাজনীতিবিদ্ বা কোন দেশের মন্ত্রীমণ্ডলী নয়। জাতির প্রতিদিনের চেহারা প্রতিফলিত হয় সংবাদপত্রে। সামগ্রিকভাবে সমাজদেহের চেহারা আমরা দেখতে পাই জাতীয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। সংবাদপত্রকে সে সঙ্গে জাতির কণ্ঠস্বর বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। সে কণ্ঠস্বরকে তোষণ বা শাসন যেভাবেই হোক—স্তব্ধ করে দেয়া মানে জাতিকে বোবা বানিয়ে দেয়া। মানুষ কখনও স্বাভাবিক মানুষ নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞান-মতে কালা বোবারা স্বভাবতঃই কিছুটা আহাম্মক হয়ে থাকে, ওদের মানসিক বিকাশ পূর্ণতা পায় না সারা জীবনেও। মানুষ হিসেবে ওরা সব সময় থেকে যায় ইনফেরিওর বা হীন স্তরে। একটা জাতির যদি এমন দশা ঘটে তাহ'লে পরিণামটা শিউরে উঠবার মতো নয় কি? স্বাধীন দেশে আমরা কেন বোবা মানুষ হয়ে থাকতে যাব? ডাক্তারকে মেরে-ধরে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার যে ফল তাকে প্রচুর খাইয়ে-দাইয়ে মোটা ফিস দিয়ে বৈঠকখানা থেকে বিদায় দেয়ার ও একই পরিণতি। অর্থাৎ রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসার সুযোগ দেয়া না হ'লে বর্ণিত দুই অবস্থার পরিণাম একই না হয়ে যায় না। খোসামুদে কথায় রোগী আরোগ্য হয়েছে তেমন কথা আজো শোনা যায়নি। অবশ্য ডাক্তার আর সংবাদপত্রসেবীকে নিরপেক্ষ আর সত্যবাদী হতে

হয়। এ তাঁদের কর্তব্য, এ তাদের ধর্ম। সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যই তাঁদেরকে এ কর্তব্য পালনের সুযোগ দেয়া উচিত। সংবাদপত্রের জন্যই অপরিহার্য নয়, জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যও তা আবশ্যক।

সংবাদপত্র নামে সংবাদপত্র হ'লেও তা শুধু সংবাদ পরিবেশন করে না, মতামতও পরিবেশন করে থাকে। সংবাদ পরিবেশনের মধ্যেও যথেষ্ট মারপ্যাঁচ ও কৌশল রয়েছে, যার ফলে সাদামটা সংবাদও অনেক সময় বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে বসে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল সংবাদপত্র তাতেও নিজের উপর বিপদ ডেকে আনে। আপনারা জানেন, সম্প্রতি আমাদের দেশেও সংবাদপত্র-জগতে তেমন বিপদ কারো কারো উপর ঘটেছে। কোন কোন সাংবাদিক সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে জীবিকা বদল করতে বাধ্য হয়েছেন। স্বেচ্ছায় জীবিকা বদল আর ঘাড় ধরে জীবিকা বদলানোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাতে সাংবাদিকের মর্যাদা আর ব্যক্তি-স্বাধীনতা দুই-ই ক্ষুণ্ণ হয়।

ফ্রি প্রেস বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা সবাই বলে থাকেন। সাংবাদিকরা যেমন তেমনি, রাষ্ট্রপরিচালকরাও এ স্বাধীনতার প্রয়োজন মুখে অন্ততঃ স্বীকার করেন। দেখে অবাক হতে হয়, যাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন তাঁরাই বরং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বেশী বলে থাকেন। দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রয়েছে এ কথাটা তাঁরাও বারে বারে উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু উচ্চারণ করাটা তো বড় কথা নয়, বড় কথা সাংবাদিকরা তা প্রতিদিনের জীবনে অনুভব করছেন কি না সেটাই বিচার্য। বাস্তবে তার স্বীকৃতি ছাড়া তেমন উচ্চারণের কতটুকু মূল্য? এতসব উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণ সত্ত্বেও আমরা কি সগৌরবে বলতে পারি আমাদের কোন পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয় নি, আমাদের কোন সাংবাদিককে জেলে দেয়া হয় নি? স্বাধীনতার পর তেমন অঘটন ঘটেনি?

যত ক্ষুদ্রই হোক, সব সংবাদপত্রই জনমতের বাহক। জাতীয় জীবনে তার অস্তিত্বের প্রয়োজন রয়েছে। যাঁদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তাঁদের এ সত্যটা বোঝা উচিত—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করার মানে জাতির স্বাধীনতা হরণ করা, জাতীয় সংবাদপত্রকে দুর্বল ও ক্ষীণকণ্ঠ করে

দেয়া মানে জাতিকে দুর্বল ও রুদ্ধবাক্ করে দেয়া। আমার বিশ্বাস স্বাধীন দেশে রাষ্ট্র আর জাতি এবং উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন ও অবিভাজ্য। আমার এও বিশ্বাস এ উপলব্ধি থেকেই সংবাদপত্র রাষ্ট্র বা সরকারের সমালোচনা করে থাকে। যে-কোন সমালোচনার পেছনে বৈরীভাব কল্পনা খুব সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়। ক্ষমতাসীনদের এ সত্যটুকু উপলব্ধি করা চাই— সমালোচনায়ই সরকার দুর্বল হয় না, বরং সবল হওয়ার পথ খুঁজে পায়, যদি তাঁরা তেমন পথের সন্ধানী হন। সংবাদপত্রের বিরূপ সমালোচনায় কোন সরকারের পতন হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অন্ততঃ খুঁজে পাওয়া যাবে না, সমালোচনায় সরকার বরং নিজেকে শোধরাবার একটা সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রতিবেশী ভারত ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমালোচনা এবং সত্যকে প্রকাশ করার অধিকার সংবাদপত্র কখনো কোন অবস্থাতেই বিসর্জন দিতে পারে না, করলে সাংবাদিকতার স্বধর্মচ্যুতি ঘটে। তখন তার অস্তিত্ব সমাজ ও জাতির স্বার্থের দিক থেকে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সততার সঙ্গে সাংবাদিকের কর্তব্য পালন করতে হ'লে সাংবাদিকদের ঝুঁকি নিতেই হবে। এদেশের সাংবাদিকরাও এ যাবৎ ঝুঁকি কম নেন নি। রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বে তারাও বহুবিধ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, অনেকে ভুগেছেন নানাভাবে। আমাদের সাংবাদিকদের অতীত ভূমিকা কিছুমাত্র অগৌরবের নয়। বাংলাদেশে সংবাদিকতার সূচনা বলা যায় পাকিস্তান আমল থেকে। আজ আমাদের সংবাদপত্র সার্বিকভাবে কৈশোর উত্তীর্ণ এ দাবি বোধ করি করা যায়। এর পেছনে আমাদের অগণিত সাংবাদিকের অনেক সাধনা, শ্রম ও ত্যাগ রয়েছে অনেকে তিলে তিলে এর পেছনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। যদিও ধনতন্ত্রের অনুষঙ্গ হিসেবে আধুনিক সংবাদপত্রের আবির্ভাব, প্রসার ও সমৃদ্ধি সূচনায় আমাদের দেশের অবস্থা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত—স্বল্প পুঁজি দরিদ্ররাই দেশে বহু শ্রমের বিনিময়ে আমাদের সংবাদপত্র শিল্পকে গড়ে তুলছেন। সত্যিকার অর্থে ধন-তন্ত্রের আবির্ভাব বাংলাদেশে কখনো ঘটে নি। বৈদেশিকদের পুঁজি আর মালিকানায় গড়ে উঠার মুহূর্তেই আমাদের ইতিহাসে পালা-

বদল ঘটে গেল রাতারাতি। এখন পুঁজিপতির ভূমিকা সরকারের। তাই আমাদের সবকিছু মায় সংবাদপত্র পর্যন্ত এখন সরকারনির্ভর। এখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ত্যাগ, শ্রম, সদিচ্ছা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও মূল্যহীন ও নিষ্ফল হয়ে পড়েছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাই এখন সবচেয়ে বড় পুঁজি—এছাড়া সংবাদপত্রের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার আজ তার পৃষ্ঠপোষকতা অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের দরজা বন্ধ করে দিলে কালই বহু পত্রিকাকে পাততাড়ি গুটাতে হবে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ কিছুতেই সুস্থ অবস্থা নয়। বিজ্ঞাপনরূপী সাব্‌সিডির জোরেই যে কাগজের উৎপাদন খরচ হয়তো আট আনা, ও পাঠকদের দরজায় চার আনায় পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। এ রকম সাব্‌সিডিনির্ভর সংবাদপত্র কিভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে? সংবাদপত্র আর সাংবাদিকদের সামনে আজ এ এক বড় জিজ্ঞাসা। অথচ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তাদের চাই-ই চাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার প্রয়োজন আরো বেড়ে গেছে। আমলা, শাসক আর রাজনীতিবিদ্‌রা পদে পদে যে ভুল-ভ্রান্তি করে চলেছেন তার প্রতি সংবাদপত্র আর সাংবাদিকরা যদি দৃষ্টি আকর্ষণ না করেন তা'হলে সংশোধনের কোন পথই সরকার খুঁজে পাবে না। আর তার ক্ষতিটা পোহাতে হবে সমগ্র জাতিকে, সারা দেশকে। তোয়াজ, তোষণ আর উচ্ছ্বাস-আবেগের দিন গত হয়ে গেছে, স্বাধীনতার জীবন-মরণ লড়াইয়ের দিনে আমরা অনেক রাজা-উজির মেরেছি, জীবিত টিক্কা খাঁকে আমরা বহুবার কতল করেছি, বন্দী বঙ্গবন্ধুকে আমরা মুক্ত করেছি অকুণ্ঠ কণ্ঠে, বহু জীবিতকে মৃত আর মৃতকে জীবিত করতে দ্বিধা করি নি সেদিন। সেদিন এসব করেছিলাম আমরা দেশের স্বার্থে, স্বাধীনতার স্বার্থে, জাতিকে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে, ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার স্বার্থে। সেদিন সবই আমাদের জন্য ছিল জায়েজ। কারণ বাঁচার দাবি, জীবনের দাবি নিয়ে কোন আপস চলে না। কিন্তু স্বাধীনতার পর গন্তব্যে যখন আমরা পৌঁছে গেছি তখন এ সবকে তো আর কোন অর্থেই জায়েজ বলতে পারি না। কোন্ অজুহাতে আজ আমরা মিথ্যা আর ফাঁপানো কথাকে প্রশ্রয় দেব? এখন সত্যের কঠিন

মাটিতে আমাদের পা রাখতে হবে। মিথ্যার বেলুন ছড়িয়ে তো আর দেশ বা নতুন জাতি গড়া যায় না। মিথ্যার মুখোস খুলে ফেলা সাংবাদিকদের এক পবিত্র দায়িত্ব। আজ আপনাদের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে এ সত্য আপনাদের, বিশেষ করে আমাদের তরুণ সাংবাদিকদের উপলব্ধি করতে হবে। আপনারা সত্যের সৈনিক, মিথ্যার উৎস যদি সরকারী কারখানাও হয়, তার বিরুদ্ধেও আপনাদের সংগ্রাম না করে উপায় নেই। তা না হ'লে এ পেশায় আসার কোন মানে হয় না। অফিসিয়াল বা সরকারী সাংবাদিক হওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব নেই। সর্ব অবস্থায় সত্যের পতাকা আপনাদেরকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। তা না হ'লে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার এ দুর্দশা কখনো ঘুচবে না। আজ আমাদের সংবাদপত্র অনেকখানি বিবর্ণ, রক্তহীন ও ফ্যাঁকাশে হয়ে পড়েছে। একটির পাতা উল্টালে দ্বিতীয়টির পাতা উল্টাবার প্রয়োজনই পড়ে না। বাংলাদেশের সংবাদপত্র ইতিপূর্বে আর কখনো এমন ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়ে নি। অত্যন্ত বেদনার সাথে বলছি, আজ আমাদের সংবাদপত্রের কোন ব্যক্তিত্বই নেই। আয়ুব-মোনেমের আমলেরই যেন পুনরাবৃত্তি চলেছে। কারণে-অকারণে রাজনীতিবিদ্‌দের ছবি ছাপাবার সে হিড়িক—সে ট্র্যাডিশনই যেন সামনে চলেছে। এস. ওয়াজেদ আলী সাহেবের সে মোক্ষম উক্তিটা আমাদের জীবনে কিছুতেই যেন মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না আজো। আমাদের সংবাদপত্র আর সাংবাদিকতাকে এ শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আপনাদের। কিভাবে নির্ভয়ে অকুণ্ঠে সত্যকে প্রকাশ করে। আমার বিশ্বাস, খাঁটি সাংবাদিকের জীবনের এ হচ্ছে দর্শন বা ফিলোসফি।

প্রাচীন একটি বৃটিশ পত্রিকা থেকে ক্ষুদ্র একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ১৯১৮-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংল্যাণ্ডেও বোধ করি মিথ্যার শাক দিয়ে সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা ব্যাপক হারে চলেছিল। তা না হ'লে ১৯১৯-এর এপ্রিলের ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের এক সম্পাদকীয়তে একথাগুলো কেন লেখা হবে?

"During the war we all, to put it bluntly, had to do a good deal of lying, active or passive, of omission if not

of commission, in order to save our country from ruin, but when fighting is over, the truth ought to be one of the first articles of diet to be exempted from rationing"

আমাদের আজ একথাও দাবি, সত্য চাল চিনি বা তেল গম নয়, অতএব সত্যকে অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধে প্রকাশের সুযোগ দিন, তা'হলে সংবাদপত্র ও সংবাদিকতা বর্তমানে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে উঠবে—লাভ করবে ব্যক্তিত্ব। বলা বাহুল্য, শক্তিশালী সংবাদপত্র রাষ্ট্রেরও শক্তির অন্যতম উৎস।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে ?

মাদ্রাসা শিক্ষা কথাটা বহুল পরিচিত। এর পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস আর দীর্ঘতর ঐতিহ্য রয়েছে। এ হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ভূঁইফোড় কিছু নয়। মাদ্রাসা শিক্ষা মানে আসলে ধর্মীয় শিক্ষা। এর মূল্য আর এর প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণও এ কারণেই। বিকর্ষণটা হালের। এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী বর্তমানে বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলাম। তাঁরাই আলেমসমাজকে রাজনীতির দিকে টেনে নিয়ে আসে, ঠেলে দেয় এবং নানাভাবে প্ররোচিত করে এ পথে। তাঁদের প্রচারণায় অনেকে প্রলুব্ধ হয়ে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। অথচ আধুনিক রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে এঁদের কিছুমাত্র পরিচয় নেই। ফলে দেশের রাজনীতিতে এঁরা কিছুমাত্র স্বচ্ছতা যেমন আনতে পারেন নি তেমনি পারেন নি কোন অবদান সৃষ্টি করতেও। বরং ধর্মের নামে তাঁরা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে করে তুলেছিলেন অত্যন্ত ঘোলাটে আর দূষিত। ধর্ম আর ধর্ম-শিক্ষার একটি মহত্তর ভূমিকা আছে, সে ভূমিকা থেকে ধর্মকে টেনে এনে পার্থিব দলীয় স্বার্থের হাতিয়ার করে তুললে ধর্মকে শুধু যে খাটো করা হয় তা-ই নয়, করা হয় তার অপব্যবহারও। এ অপব্যবহার চরমে পৌঁছে পাকিস্তানী হানাদারদের সর্বাত্মক আক্রমণের সময়। আলেম-সমাজ তখন দেশের জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান নি, স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেন নি কোন অংশ। বরং তাঁরা বা তাঁদের দল উল্টো 'আল-বদর,' 'আলশামস্' ইত্যাদি গণ-শত্রুদের সৃষ্টি করে চরম দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিয়েছেন। পরে দেখা গেছে এ 'আল-বদর', 'আলশামস'-ই হয়েছে হানা-দারদের বংশধর, দোসর আর তাঁবেদার। তাঁবেদারেরা দেশের আর দশের

মানুষের বিরুদ্ধে কত জঘন্যতম অপরাধ যে করেছে, তার খতিয়ান দেশের কারো কাছে আজ আর অজানা নয়। তাদের দুষ্কর্ম এত অমানুষিক আর এত বর্বরোচিত যে, তা ক্ষমার কথা আমরা ভাবতেই পারি না।

সব আলেম বা জামাতে ইসলামের সব সমর্থকই যে মন্দ বা এ ধরনের অপরাধে অপরাধী, তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। মানুষের উপর আজো আমার মনে কিছুটা আস্থা আছে, তাই অমন ঢালাও অভিযোগ আমি কোন দলের বিরুদ্ধেই করতে চাই না। এমন কি, সব 'আল-বদর', 'আল-শামস্' ও সবাই মাদ্রাসা শিক্ষার্থী বা আলেম, তাও বোধ হয় ঠিক নয়। বহু ইংরেজী-বাংলা শিক্ষিতও 'আল-বদর', 'আল-শামস্' আর 'রাজাকার' হয়ে বহু অনর্থ ঘটিয়েছে দেশে, অত্যাচার-উৎপীড়নে এরাও মানুষের জীবনকে করে তুলেছিল অতিষ্ঠ এবং এও মিথ্যা নয় যে, নামকরা দালালদের প্রায় সবাই ইংরেজী শিক্ষিত। তবুও দেশ থেকে ইংরেজী, তথা আধুনিক শিক্ষা তুলে দেয়ার দাবি ওঠেনি। তেমন দাবি কেউ-ই করে নি আজ পর্যন্ত। আলেম সমাজ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দিয়ে চরম ভুল করেছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, 'পূর্বদেশের' পৃষ্ঠায় আমি একদিন 'রাজনীতি ও আলেম সমাজ' এ নামের প্রবন্ধ লিখে সঙ্কটের বহু আগেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলাম। 'ধর্ম'-ভিত্তিক রাষ্ট্র ঃ এক অবাস্তব কল্পনা', তখন আমার এ নামের এক প্রবন্ধও 'পূর্বদেশে'ই ছাপা হয়েছিল। এছাড়া আরো কোন কোন প্রবন্ধে আমি আলেম সমাজকে রাজনীতি থেকে বিরত রাখার জন্য একজন সামান্য লেখক হিসেবে যেটুকু চেষ্টা করা সম্ভব, তা করেছি। কিন্তু লেখকের কথা কে শোনে?

আমি ভবিষ্যদ্বক্তা নই, হতে চাইও না। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে ঐ কথাগুলি বলার প্রয়োজন তখন আমি বোধ করেছিলাম। তাই না বলে পারি নি। আমার আর এক প্রবন্ধের নাম 'ধর্ম' ভিত্তিক রাজনীতির বিপদ', যে বিপদ আলেম সমাজ একদিন দেশের সামনে ডেকে

এনেছিলেন। আজ সে বিপদের সম্মুখীন তাঁরা নিজেরাই। আমার এসব প্রবন্ধ সাধারণ নির্বাচনের অনেক আগেই লেখা এবং 'সমকালীন চিন্তা' নামক বইতে সব কটা লেখাই হয়েছে পূর্ণ মুদ্রিত। কিছুটা নীতি আর রুচিবিরোধী হলেও নিজের লেখায় নিজের প্রবন্ধের যে উল্লেখ করলাম তার একমাত্র কারণ পাছে পাঠকেরা না আমাকে ভুল বুঝে বসেন। আমার প্রধান বক্তব্য একের দোষে যেন দশে দণ্ড না পায়। যারা দোষী তাদের আইনানুসারে বিচার হোক, বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হলে ওদের দেওয়া হোক চরম দণ্ড। এ বিষয়ে কারো বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকার কথা নয়। আমার এও বিশ্বাস কোন পদ্ধতিই সর্বতো-ভাবে নিন্দনীয় নয়। সমাজের চাহিদা আর প্রয়োজনের তাগিদেই সব পদ্ধতির উদ্ভব। কালের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে কোন পদ্ধতি যদি চলতে অপারগ হয় তাকে অবিলম্বে সংশোধন করা উচিত অর্থাৎ সংশোধনের সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ। মাদ্রাসা শিক্ষা আর আলেম সমাজ প্রায় অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কিত। এ দুইকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। তার ফলেই বোধ করি কিছু সংখ্যক আলেমের দেশ আর মানবতাবিরোধী দুষ্কর্মের জন্য কেউ কেউ গোটা মাদ্রাসা শিক্ষাকেই তুলে দেওয়ার প্রস্তাব তুলেছেন। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। তড়িঘড়ি কিছু করা মোটেও সঙ্গত হবে না। কোন রকম চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে দুটি প্রশ্নের জবাব আমাদের খুঁজে দেখতে হবে :

প্রথমতঃ, মাদ্রাসা শিক্ষার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না?

দ্বিতীয়তঃ, এ শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজের দাবি কতখানি?

গণতান্ত্রিক কোন সরকারই জনগণের এক বৃহত্তর অংশের দাবিকে উপেক্ষা করতে পারে না। তাই জনগণের মতামতের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। এ জনগণ আমার বিশ্বাস হয় নির্দলীয় অথবা সর্বদলীয়। মাদ্রাসা শিক্ষা মানে ধর্মীয় শিক্ষা, সে কথা আগেও একবার উল্লেখ করেছি। বাংলাদেশের বৃহত্তম জনতা নিঃসন্দেহে মুসলমান সমাজভুক্ত। এ সমাজ শুধু শহরে, নগরে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

মনোনীত নয় সমাজের বৃহত্তর অংশ ছড়িয়ে আছে গ্রামে-পল্লীতে দেশের দূর-দূরান্তে। আর বাংলাদেশ যে পল্লীপ্রধান এও সর্বজনবিদিত। আমার বিশ্বাস, আমাদের পল্লীবাসীরা আজো অনেকখানি ধর্ম প্রাণ - হোক তা আনুষ্ঠানিক ধর্ম। এদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক আর সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠানে স্থান কতটুকু, তা কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর এ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কাদের হাতে? সে সব লোকের প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা কোথায় হয়? এসব প্রশ্নের উত্তর সবারই জানা।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েই আমাদের জীবন কাটে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গৃহীত হলেও এসবের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বা এ মুহূর্তে ফুরিয়ে যাবে বলে আমার মনে হয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থও বোধ করি এ নয়। এখনো দেখি বড় বড় রাজনৈতিক জনসভায়ও এটা ওটার জন্য মোনাজাত করা হয়, কোন কোন সভা এখনো শুরু হয় কোরান তেলাওয়াৎ করে। আর তা করেন কোন না কোন মৌলবী বা আধা মৌলবী। অর্থাৎ যাঁর রয়েছে কিঞ্চিৎ ধর্ম শিক্ষা।

সমাজের ধর্ম-জীবন যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা প্রায় সবাই মাদ্রাসার দোর-গোড়া মাড়িয়ে আসা মানুষ। কেউ কেউ পুরোপুরি আলেম, অনেকে তা নন্। তবুও সমাজের একটা দিকের প্রয়োজন এঁরা মেটান। যদি এ প্রয়োজনের দরকার না থাকে তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষারও প্রয়োজন নেই। যদি বলেন মসজিদে মসজিদে আজান দেওয়ার, কিংবা জমা'তে ইমামতীর, জুমা আর ঈদে খোৎবা পড়ার অথবা জানাজা পড়ার দরকার নেই তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষা অনায়াসে এ মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা: স্বাধীনতার পর সমাজ থেকে এসব কি চিরতরে উঠে যাবে, না উঠে গেছে? যদি না যায় এসব দায়িত্ব পালনের জন্য লোক পাওয়া যাবে কোথায়? ডক্টর শহীদুল্লাহ্ গ্রামে গ্রামে জন্ম ন না। অন্ততঃ ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক গণমুখী শিক্ষার কারখানা থেকে যতদিন ঐসব ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের উপযোগী লোক বেরিয়ে না আসে ততদিন অন্ততঃ মাদ্রাসা শিক্ষা চালু না রেখে উপায় নেই।

মোল্লা-মৌলবীরা সমাজে নিন্দিত কিন্তু নিন্দাকারীদেরও জীবনে (বা মৃত্যুতে) এমন মুহূর্ত আসে যখন সর্বাগ্রে ঐ নিন্দিতদেরই ডাক পড়ে। অতি সাধারণ বিয়েটা জায়েজ করতেও মোল্লা-মৌলবীদের মন্ত্র আওড়াতে হয় এখনো। না হয় আন্তরিক 'মহব্বৎ' থাকলেও মিলনে সোয়াস্তি পাওয়া যায় না, মিলনের অনিবার্য ফল সন্তানই বৈধ কি না তাতেও মনে সন্দেহ কুঁৎ কুঁৎ করতে থাকে। এসব হয়তো মামুলি, হয়তো অর্থহীন কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে বহু প্রজননের অভ্যস্ত আচরণের ফলে তা সামাজিক মানুষের প্রায় অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে। তাই এক অক্ষর না বুঝলেও এসব অনুষ্ঠানে মোল্লা-মৌলবীর কিছুটা পাঠ বা আবৃত্তি থাকা চাই। কলমের এক খোঁচায় সমাজ-দেহ থেকে এসব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তা বিশ্বাস করা যায় না।

সেদিন মরহুম সৈয়দ নওসের আলী সাহেবের জানাজায় জনাব আবদুল হাসেমও উপস্থিত ছিলেন কিন্তু জানাজায় ইমামতি তিনি করেন নি, করলেও মরহুমের ওয়ারিশরা খুব যে খুশী হতেন তা মনে হয় না। যদিও তিনি 'ক্রিড অব ইসলাম'-এর মতো মূল্যবান বই লিখেছেন। আমার বিশ্বাস যে-কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মানুষ পাণ্ডিত্যের চেয়েও কিছুটা পোশাকী পরহেজগারীও দাবী করে। ব্যক্তির মত কোন পদ্ধতিও সংশোধনের বাইরে নয়। প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষার সংশোধনের যে প্রয়োজন রয়েছে তাতে দ্বিমত নেই। এতকাল উর্দুই ছিল মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষার বাহন। এ ত্রুটি সংশোধনের উদ্যোগ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমেও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মত মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলাই হবে এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয় প্রধান ত্রুটি পাঠ্যসূচী—এখনো ওখানে মান্ধাতার আমলের পাঠ্যসূচীই চালু। ফলে আধুনিক পেশা আর জীবিকার ক্ষেত্রে ওখানকার ছেলেরা প্রবেশ করতে পারে না যদি না আবার ফিরে এসে সেক্যুলার বিদ্যা আয়ত্ত করা না হয়। আধুনিক পেশা আর জীবিকার উপযোগী অর্থাৎ রাষ্ট্রের যে ধরনের নাগরিক প্রয়োজন সে ধরনের নাগরিক তৈয়ারীর অনুকূল পাঠ্যসূচীও মাদ্রাসা-

গুলিতে যাতে চালু হয় সে ব্যাস্থা অচিরেই গ্রহণ করা উচিত হবে। প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশন এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত পথ-নির্দেশ না করতে পারার কথা নয়। সমাজে যদি ধর্ম থাকে তাহলে কোন না কোন পদ্ধতির ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতেই হবে। কোন বিশেষ ধর্মের ধর্ম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র যদি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য না করতে চায় তা না করতে পারে। কিন্তু ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র কোন মতেই জোর করে বন্ধ কিংবা তুলে দিতে পারে না। দিলে তা হবে ধর্মে আর ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের সামিল। আর তা হবে আর এক রকম স্বৈরাচার।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা প্রায় নৈরাজ্যের সম্মুখীন

॥ ক ॥

কেন? এমন অবস্থা হওয়ার ত কোন কারণ ছিল না। আমরা নিজেরাই এ অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। আমরা মানে আমাদের সরকার নেতা-উপনেতা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ছাত্র, অভিভাবক সবাই। সবাই মিলে আমরা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা নৈরাজ্য ডেকে এনেছি আজ। এ অবস্থার শুরু অনেক আগে থেকেই, এ সংকট চরম অবস্থায় পৌঁছে-ছিল ১৯৬৮-৬৯ এ। সে সময় শিক্ষা সম্বন্ধে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেগুলির নাম যথাক্রমে: (১) ধর্মভিত্তিক বনাম ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রসঙ্গে, (২) শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি মোটাকথা, (৩) সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে শিক্ষা সম্পর্কে দুটি কথা, (৪) রাষ্ট্র: সমাজ আর ছাত্র, (৫) শিক্ষকদের প্রতি ভাষণ ও (৬) ছাত্র-রাজনীতির ভয়াবহ পরিণতি। এ সবকটি লেখা তখনকার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং পরে আমার 'সমকালীন চিন্তা' নামক বইতেও পেয়েছে স্থান। সেদিন শিক্ষা আমাকে কতখানি ভাবিয়ে তুলেছিল এসব লেখায় তার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ হয়েছে। আজ দেশ পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন। অবসান হয়েছে পাকিস্তানী যুগের। তবুও শিক্ষা সম্বন্ধে সেদিন যেসব কথা আমি বলেছিলাম তা আজো আমার কাছে সত্য হয়ে আছে। তাই এখনকার নৈরাজ্য সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমার ঐসব মন্তব্য থেকে কিছুটা দীর্ঘ পুনরাবৃত্তি করছি, তাহলে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মোটামুটি পরিচয় পাঠকেরা জানতে পারবেন।

ইংরেজ আমলে যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু ছিল তা শুধু বহু যোগ্য মানুষ সৃষ্টি করেছে তা নয়, অসংখ্য খাঁটি মুসলমান সৃষ্টিতেও তা কিছুমাত্র

বাধা হয় নি। সে মুসলমানরা যে এখনকার শিক্ষিত মুসলমানদের চেয়ে গড়পড়তা অনেক যোগ্য ও ভালো মুসলমান ছিল, সে সম্বন্ধে দ্বিমতের অবসর আছে বলে মনে হয় না। সে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অনেকখানি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, সরল আর সাধারণের বোধগম্য। গত দুই দশকে স্পষ্ট আর অর্থপূর্ণ ব্যবস্থাকে নানা কমিশনের নানা উদ্ভট আর অবান্তর সুপারিশের মারপ্যাঁচে ফেলে এখন স্রেফ ঘোলাটে দুর্বোধ্য আর ছাত্রদের জন্য এক দুর্বহ বোঝা করে তোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে শিক্ষা নিয়ে এমন 'তোগলকী কাণ্ড' আর কখনো ঘটে নি। পাকিস্তান-পূর্ববর্তী শিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে পাকিস্তান পরবর্তী শিক্ষিত মুসলমানের তুলনা করে দেখলে সার্বিক যোগ্যতা আর আচার-আচরণে যে পার্থক্য দেখা যায় তা মনে হয় এ 'তোগলকী' নীতিরই পরিণতি। 'ফলেন পরিচিয়তে'—সব নীতি আর পদ্ধতি বিচারের এ ত একমাত্র মাপকাঠি।

শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার—শিক্ষা দান আর শিক্ষা গ্রহণ দুই-ই। এর পেছনে দীর্ঘ প্রস্তুতি চাই, বিশেষ করে মানসিক প্রস্তুতি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসের ফলে শিক্ষকরা নিজেদের কর্তব্য আর দায়িত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করেন, ছাত্ররাও নিজেদের পঠিতব্য সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট পূর্বধারণা নিয়ে শিক্ষার অঙ্গনে পারে প্রবেশ করতে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এ রকম অবস্থায় অভিভাবকদেরও জানা থাকে, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা কি কি বিষয় পড়েছে, জীবনে তা কতখানি কাজে আসবে, ভবিষ্যতে জীবিকার পথ তাদের সামনে খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা এতে কতটুকু ইত্যাদি। এসবের প্রধান শর্ত শিক্ষাসূচী আর শিক্ষা পদ্ধতিতে স্থিতিশীলতা। স্থিতিশীলতা মানে জড়তা নয়, কালের বা সমাজের প্রয়োজন আর চাহিদাকে অস্বীকার করে স্থাণু হয়ে বসে থাকা নয়। তবে রদবদল আর বিবর্তনের গতি ধীরে ধীরে আর ধাপে ধাপে হওয়া চাই। এক-একটা ধাপ জাতির বা সমাজের ব্যবহারিক আর মানসিক অভিজ্ঞতার অঙ্গ হয়ে ওঠার পর, তবেই পরবর্তী ধাপের জন্য যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়। অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসকে আমল না দিয়ে আমাদের শিক্ষা

পদ্ধতিতে এখন যে ওলটপালট ঘটানো হয়েছে ও হচ্ছে, তার পরিণাম ভেবে শিক্ষাবিদ মাত্রই চিন্তিত না হয়ে পারে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন যে দ্রুত আর সার্বিক অবক্ষয় ঘটে চলেছে, তা কারো চোখ এড়াবার কথা নয়। শিক্ষা জিনিসটা এক সার্বিক ব্যাপার, জীবনের সর্বস্তর জুড়ে তার প্রভাব। এখন লেখাপড়ার মান যেমন অধঃপতনের দিকে দ্রুত নেমে যাচ্ছে, তেমনি নৈতিক চেতনাও আজ অবনতির চরম পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। সমাজে তা বটেই, শিক্ষা-জীবন থেকেও নৈতিকবোধ আজ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। এর সঙ্গে শিক্ষানীতি আর পদ্ধতির কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই, তা কি বলা যায়? রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক জিনিস, শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। স্বভাব আর চরিত্রে দুই-ই বিপরীত। তাই সব উন্নত দেশে শিক্ষাকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। কথায় কথায় তারা শিক্ষা-সংস্কারে হাত দেয় না। ইংল্যাণ্ডের মতো বুনিয়াদী গণতন্ত্রের দেশেও সরকারের পতন আর রদবদল ঘটে। তাই বলে শিক্ষা পদ্ধতিতেও সঙ্গে সঙ্গে রদবদল ঘটাতে তারা উঠে-পড়ে লাগে না। শিক্ষা থেকে জাতীয় জীবনে সুফল পেতে হলে একটা ধারাবাহিকে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন—এ সত্যটুকু ঐদেশের রাজনৈতিক দল আর নেতাদের শুধু যে জানা তা নয় তারা সেটা মেনেও চলে। যে শিক্ষা পদ্ধতির উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছিলাম তা মোটেও মন্দ ছিল না। তার থেকে যথেষ্ট সুফল আমরা পেয়েছি, যে পদ্ধতি থেকে যোগ্যতম মানুষের আবির্ভাব যে আমাদের সমাজেও ঘটেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আমার "শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি মোটা কথা" প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচন করেছি, সে প্রবন্ধ থেকে প্রাথমিক কয়েকটি কথা নিয়ে উদ্ধৃত হলো ঃ

"মোটকথা শিক্ষা থেকে সুফল পেতে হলে তাতে ঘন ঘন হস্তক্ষেপ করা আবাঞ্ছনীয়। যতদিন হস্তক্ষেপ ঘটে নি, ততদিন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমাদের দেশ আর সমাজ উপকৃত হয়েছে। আমাদের উপযুক্ততা অনুসারে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা যে ঐ শিক্ষা থেকে মোটামুটি ঘটেছে, তাতেও সন্দেহ নেই। ঘটেনি বলা

স্রেফ সত্যের অপলাপ করা। প্রমাণ, রাজনৈতিক উত্থান-পতন সত্ত্বেও আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থা কখনো অচল হয়ে থাকেনি। ক্ষমতা-লোভীদের হস্তক্ষেপের ফলে যদি কখনো অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে, সে অন্য কথা, তার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা দায়ী নয়। গত চব্বিশ বছরে কত সরকারই এলো কত সরকারই গেলো, দেখে অবাক হতে হয়, যে সরকারই আসে সে সরকারই অমনি তড়িঘড়ি একটা শিক্ষা কমিশন বসান, শিক্ষা সংস্কারের নামে রাতারাতি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা ওলটপালট তথা রীতিমতো একটা অরাজকতা ডেকে না এনে তাঁরা যেন কিছুতেই স্বস্তি পান না। দেশের সামনে আজ সহস্র সমস্যা আশু সমাধানের প্রতীক্ষায়। সে সবে হাত না দিয়ে তাঁরা কেন যে অকারণে শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন, তা আমার মতো লোকের বুদ্ধির অগম্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাঁরা বসেন, তাঁদের অনেকে যথারীতি শিক্ষিত নন, তবুও শিক্ষা নিয়ে অনধিকারচর্চা তাঁদের চাই-ই। আয়ুব আমল থেকেই এ অবস্থার সূচনা।"

॥ খ ॥

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যে এখন এক ভয়াবহ রকম নৈরাজ্যের সম্মুখীন এ সম্বন্ধে বোধ করি সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে জিজ্ঞাসা এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? নেহাৎ অনিচ্ছায় আর অত্যন্ত বেদনার সাথে যদি বলি—সরকার, তাহলে আমি জানি অনেকে অসন্তুষ্ট হবেন, আবার কেউ কেউ বিরক্ত হবেন, আবার কেউ কেউ লেখককে সরকার-বিরোধী বলেও হয়তো অভিযুক্ত করবেন। তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, আর আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি গণতন্ত্রের সরকার-বিরোধী হওয়া কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নয়। বরং যেখানে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত সেখানে চুপ করে থাকা, সত্য না বলা শুধু যে লজ্জার বিষয় বা কর্তব্যে অবহেলা তা নয় বরং একরূপ দেশদ্রোহিতাও। বেদনার সাথে বলেছি এ কারণে যে এ সরকারকে আমরাই ত চেয়েছিলাম। ভোটও দিয়েছি

আমেরা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ সরকারকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চায়নি বলেই ত এহিয়া খাঁ। আর তাঁর সরকারের সঙ্গে সারা সুবে বাংলার বিরোধ, যার পরিণাম রক্তাক্ত সংগ্রাম আর স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। কাজেই এ সরকারকে হেয় করা কি দুর্বল করা আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ তাতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই। দেশের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল স্বাভাবিক অবস্থায় সরকারবিরোধী ভূমিকা পালনের কথা তারাও আজ সরকারকে সাত্বিক সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। কেন? তার একমাত্র কারণ বর্তমানে বিকল্প কোন সরকার গঠনের ক্ষমতা অন্য কোন দলের নেই। অথচ দেশের শাসন কাঠামোকে ধরে রাখা আর চালু রাখার জন্য যে-কোন রকমের একটা সরকার অপরিহার্য। এ অপরিহার্যতার সুযোগ নিয়ে বর্তমান সরকার যদি বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও যা তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দেশের শিক্ষাজীবনে একটা মারাত্মক রকমের বিপর্যয় ডেকে আনে তা হলে তা কি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হয় না? দেশ আর দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে যারা ভালবাসে তেমন বিবেকী লেখকদের পক্ষে তখন কি চুপ করে থাকা সম্ভব, না উচিত?

শিক্ষার ক্ষেত্রে কি করে অত্যন্ত অকারণে এ বিপর্যয় ও অচলাবস্থা ডেকে আনা হয়েছে তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। পাঠ্যবই নিয়ে যে কেলেংকারীর সৃষ্টি হয়েছে আজ তা স্রেফ কেলেংকারী হলে হয়তো সহ্য করা যেতো কিন্তু এর ফলে শিক্ষাজীবনের এমন একটা বিপর্যয় আর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যে তা কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না, যায় না বরদাস্ত করা। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে সস্তা জনপ্রিয়তা সন্ধান করতে গিয়েই শিক্ষা দফতর দেশকে এ দারুণ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে—দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই আজ বিধ্বস্ত। এ অবস্থা দেশের মানুষের সবারই জানা। তাই নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কাছে তেমন বড় কিছু মানুষ চায় না, চায়নি তেমন অসম্ভব দাবি, কোন মহল থেকেও আজো উত্থাপিত হয়নি। তবু সরকার গায়ে পড়ে

বছরের শুরুতেই ঘোষণা করে বসলো তারা সারা প্রদেশের তাবৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেবে। শিক্ষাবিভাগের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, প্রদেশে মোটামুটি ষাট লক্ষ ছাত্রছাত্রী রয়েছে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে। ষাট লক্ষ বাদ দিয়ে যদি ত্রিশ লক্ষও ধরা হয়, আর যদি ধরা হয় গড়ে চার কি পাঁচটি করে বিষয় তাদের পড়ানো হয় তাহলে প্রায় দেড় কোটি বইয়ের প্রয়োজন। বিনামূল্যে বই বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় একথাটা কারো মাথায় ঢোকেনি যে এ স্বল্প সময়ের মধ্যে এত বই ছাপার উপযোগী কাগজ আর মুদ্রাযন্ত্র আমাদের আছে কি না? সবাচেয়ে বড় কথা প্রাথমিক স্কুলগুলোতো শ্রেফ শহরে-নগরে কেন্দ্রীভূত নয়—তা প্রদেশের দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। শহর থেকে কোন কোন স্কুলের দূরত্ব ষাট-সত্তর মাইলেরও বেশী—পথ দুর্গম, যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুরূহ। এসব স্কুলে বই পৌঁছাবার কি ব্যবস্থা? কোথায় সে সংস্থা, সে যন্ত্র, সে মেশিনারী, ব্যাংক? ব্যাংকের বাপের সাধ্যও নেই গ্রাম-গ্রামান্তরে ত্রিশ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর নাগালের মধ্যে বই পৌঁছে দেয়। সরকারের এ অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে আজ বছরের সাত মাস গত হয়ে চল্লো তবু কোন স্কুলের কোন ছাত্রই পুরো সেট বই পায় নি। এমন দাবি, শহর কি মফঃস্বলের কোন স্কুলই করতে পারবে না যে তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই পুরো বই পেয়েছে বা স্বাভাবিকভাবে তারা পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারছে। আজ শিক্ষাক্ষেত্রে এ যে অত্যন্ত দুঃখজনক এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, আমার বিশ্বাস তার জন্য সরকারই একমাত্র দায়ী। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বছরে দু-তিনটা করে বই ছেঁড়ে, বই হারিয়ে ফেলে এসব আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা। অভিভাবকরা তাদের কিনে দেন। এখন কি হবে? সরকার একটার বেশী দু'টি বই খয়রাতী দেবে না, ঐদিকে দোকানেও পাওয়া যাবে না কিনতে। হ্যাঁ, বেশী দাম দিয়ে ব্ল্যাকে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে ঐ মর্মের খবর কাগজে প্রকাশিতও হয়েছে। মনোপলি যেখানে ব্ল্যাকও সেখানে এ প্রায় অবধারিত সত্য। বোর্ড বা ব্যাংকের কর্মচারীরা সবাই সাধু নন।

দেশ আর দেশের মানুষ সরকারের কাছে বিনামূল্যে বই চায় নি, সরকার গায়ে পড়ে এ বদান্যতা না দেখালেও পারতো। বদান্যতা দেখানোর আরো হাজারো উপায় রয়েছে। বহু নিন্দিত পূর্বতন সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করেছে। বর্তমান সরকার ম্যাট্রিক পর্যন্ত অবৈতনিক কিংবা অর্ধ-অবৈতনিক করলেই জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করা হতো। অথবা বছরে এক'টা একটা শ্রেণী অবৈতনিক করা শুরু করলেই পারতো। এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে কিছুমাত্র অসুবিধাও ছিল না—প্রশাসনিক একটি মাত্র আদেশেই যথেষ্ট। কোন রকম যন্ত্র কি মেশিনারীর প্রয়োজন হতো না এতে। এ ধরনের সহজ ও অনায়াসসাধ্য পথে না গিয়ে কেন যে এক দুরূহ, যা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কিছুমাত্র ক্ষমতা বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা সরকারের নেই তা নিতে গেলো তা একমাত্র সরকারই জানে। সরকারের এ ব্যবস্থা শুধু যে এবারই ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, আগামী বছর এ ব্যর্থতা আরো ভয়ংকর রূপ নিয়ে দেখা দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। সরকারের জানা উচিত, জনগণের উপকার করতে চাইলেই উপকার করা যায় না। কিছুটা বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন হয় এবং প্রয়োজন হয় নিজেদের সাধ্য আর ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতনতা। সে সঙ্গে কিছুটা কল্পনা শক্তিও। তা না হলে হিতে বিপরীত ফল না হয়ে যায় না। পাঠ্য বইর ব্যাপারে অবিকল তাই হয়েছে।

॥ গ ॥

ব্যক্তিগত নির্বুদ্ধিতার পরিণাম ব্যক্তিগতের মধ্যেই সীমিত থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নির্বুদ্ধিতার পরিণাম সর্বব্যাপক। তাই প্রতিবাদ না করে উপায় নেই। পাঠ্য বইর দ্রুত অবনতি কারো নজর এড়াবার কথা নয়। মনোপলি যে শুধু ব্ল্যাকের সৃষ্টি করে তা নয়, মানেরও অবনতি ঘটায়। বইয়ের ক্ষেত্রে সরকারী মনোপলির যন্ত্র হচ্ছে স্কুল পাঠ্য বই সংস্থা তথা স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড। এ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পাঠ্য বইর মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। এবিষয়ে শিক্ষক আর শিক্ষার্থিমাত্র বোধ করি একমত। কোন রকম প্রতিযোগিতা নেই বলে বইর মান

জমেছে এবং এ কারণে সময়ে বইও পাওয়া যায় না। এবং সে সঙ্গে বুক ট্রেড বা বইর ব্যবসাটাকেও দেওয়া হয়েছে একদম নষ্ট করে। বইর ব্যবসার সঙ্গে সাহিত্যের সম্প্রসারণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বই-ব্যবসার সম্প্রসারণের সুযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে সাহিত্য সম্প্রসারণের সুযোগও সংকুচিত হয়ে পড়েছে আমাদের দেশে। সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশনার খতিয়ান নিলেই তা উপলব্ধি করা যাবে।

মনোপলির আর এক ত্রুটি তাতে তদবির চলে, তার সুযোগ দরাজ। ফলে অযোগ্য লোকও পেয়ে যায় সুযোগ। এ সুযোগের ফলে পাঠ্য বই সংস্কার বই লেখার জন্য এমন সব লোক নির্বাচিত হয় যারা আদৌ লেখক নয়, যাদের লেখাপড়া শুধু যে নিম্নমানের তা নয়, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান থেকেও যেন তারা বঞ্চিত। দুটো মাত্র সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি, কাণ্ডজ্ঞানহীনতার দৌড় যে কতখানি তা পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন (অবশ্য দৃষ্টান্ত দুটোই আমার শুনা, চাক্ষুষ দেখা নয়, তবে যারা বলেছেন, তাঁরা বিশ্বস্ত)।

বাংলাদেশ হওয়ার পর স্বভাবতই কোন কোন পাঠ্য বই সংশোধন করতে হচেছ। না করে উপায় নেই। বোর্ড বা বোর্ডের নিযুক্ত সংশোধক একটা বইয়ের একটা লেখা সংশোধন করছেন এভাবে ঃ বইটিতে কায়েদে আযম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছিল। বোর্ড তাতে স্লিপ লাগিয়ে ছাত্রদের নির্দেশ দিয়েছে ঃ যেখানে যেখানে কায়েদে আজম লেখা আছে সেখানে সেখানে শেখ মুজিবুর পড়তে হবে। বাদবাকি যা ছিল সবই ঠিক রয়েছে। শেখ মুজিবুরের মা-বাপের নাম আর কায়েদে আজমের মা-বাপের নাম এক নয়, জন্মস্থানও আলাদা, একজন জন্মেছেন পাকিস্তানের করাচীতে, অন্যজন বাংলাদেশের ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে। লেখা-পড়া, কর্ম-জীবন, বিয়েশাদী সবই আলাদা। এবার থেকে বোর্ডের কল্যাণে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখ মুজিবুরের বেনামীতে পড়তে হবে কিনা মোহাম্মদ আলী জিন্নার জীবনকথা! এরই নাম উদোর পিণ্ডি ভুদোর ঘাড়ে। আর এভাবেই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা পরিচিত হবে জাতির পিতার জীবনের সঙ্গে! কোন পুস্তক ব্যবসায়ী প্রকাশক কি এমন কাণ্ড করার সাহস

পেতো? যেহেতু বোর্ড সরকারী প্রতিষ্ঠান অতএব বেপরোয়া হতে তার বাধা নেই। আর একটা বই সংশোধন করা হয়েছে নাকি এভাবে। বইতে লেখা ছিল: 'তিনি প্রত্যহ সকালে উঠিয়া কোরান পাঠ করেন।' বোর্ডের সুযোগ্য সংশোধক কথাটাকে সংশোধন করেছেন এভাবে: 'তিনি প্রত্যহ সকালে উঠিয়া পূর্বদেশ পাঠ করেন।' কোথায় কোরান শরিফ আর কোথায় পূর্বদেশ! কোরান পাঠ করেন কথাটি থাকলে কি দোষ হতো? ধর্মনিরপেক্ষতার কি এ অর্থ? শিক্ষা দফতর কি বলেন? কাণ্ডজ্ঞানহীন হীনমন্যতারও একটা সীমা থাকা উচিত। কোন হিন্দু যদি গীতা, কোন বৌদ্ধ যদি ত্রিপিটক আর কোন খৃষ্টান যদি বাইবেল পাঠ করে আর তা যদি পাঠ্য বইতে উল্লিখিত হয় তাহলে কি ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়? মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী চট্টগ্রাম এসেছিলেন। তাঁর সংবর্ধনা সভার শুরুতে কোরান, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ করা হয়েছিল। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি জনসভায় ধর্মগ্রন্থ পাঠের বিরোধী তবুও এতে কোন আপত্তির কারণ দেখিনি, অন্য কেউ এতে আপত্তি তুলেছেন বলেও শুনি নি। অথচ এ গণসংবর্ধনার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারী দল।

'পাঠ্য বই সংস্থা' প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই চরম অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে আসছে। এ সংস্থাকে ঢেলে নতুন করে সাজানো উচিত। আমার মতে একটা ক্ষুদ্র সংস্থাই যথেষ্ট, এ সংস্থার কাজ হবে সিলেবাস বা পাঠ্য-সূচী রচনা করা, সে পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত বই আহ্বান করে, মান ও মেধা পরীক্ষা করে তার অনুমোদন দান করা। যেমন আগে করা হতো। তাহলে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বই লেখা আর প্রকাশিত হবে। তখন স্বভাবতই বইর মান না বেড়ে পারে না। পাঠ্য বই প্রকাশ করে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলি যদি সম্প্রসারণের সুযোগ পায় তাহলে তখন কিছুটা পুঁজি অ-পাঠ্য সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশনায়ও তারা বিনিয়োগ করবে। যেমন আগে করা হতো। দেশের পুস্তক ব্যবসাকে নষ্ট করে দেওয়ার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। এতে যে শুধু সাহিত্যের সম্প্রসারণ বিঘ্নিত হবে তা নয়,

সারা প্রদেশে কয়েক হাজার লোককেও বেকার করে দেওয়া হবে, বাস্তবে হয়েছেও। কোন গণতান্ত্রিক সরকারের এ কিছুতেই নীতি হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা কমিশনের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। এ কমিশন নিয়ে সরকার কেন যে এ তালবাহানা শুরু করেছেন তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। জানুয়ারী কিংবা ফেব্রুয়ারী মাসে এ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তারপর দীর্ঘকাল ঘুমিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতর। মাস দেড় কি দুই আগে হঠাৎ একদিন কাগজে উক্ত কমিশনের তিনজন পদকর্তার নাম প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সকলে আশা করেছিল সঙ্গে সঙ্গে পুরো কমিশনের নাম প্রকাশিত হবে। এ উপলক্ষে কোন কোন কাগজে ফলাও করে সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছিল সরকারকে অভিনন্দিত করে। কিন্তু সরকার আবারও চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকলেন। দীর্ঘকাল পর হঠাৎ জেগে উঠে সরকার আর একজন সদস্যের নাম ঘোষণা করে দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, না, সরকার শিক্ষা কমিশনের কথা ভুলে যান নি। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে পুরোপুরি সজাগ আছেন। তবে দুঃখের বিষয়, আজো পুরো কমিশনের সদস্যদের নাম-ধাম, কি নির্দেশ তাঁদের প্রতি, কখন তাঁরা রিপোর্ট দেবেন, কখন তা সরকার বাস্তবায়িত করবেন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায় নি। এমন অভূতপূর্ব সংখ্যা-গরিষ্ঠ ও গণসমর্থিত সরকারের এ গড়িমসির কারণ কি? সরকারের কোন বাধা যদি থাকে সরকার তা কি দেশের মানুষকে জানাতে পারেন না? হ্যাঁ, বাধা কিছু আছে বই কি! ছাত্র, সরকারী স্কুল ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক, সরকারী ও বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সবাই কমিশনে স্থান পেতে চান। ছাত্রপ্রতিষ্ঠান ত একটি নয়, তার উপর মাদ্রাসা শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি ইত্যাদি বহুতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ত রয়েছে দেশে। সবারই দাবি, তাঁদেরও প্রতিনিধি শিক্ষা কমিশনে নিতে হবে। শিক্ষা কমিশনে স্থান পাওয়া যেন এক বিরাট কিছু, খুব একটা যেন লাভের বস্তু! শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার যোগ্যতা যেন সবারই আয়ত্ত! এ যদি করা হয় শিক্ষা কমিশন হবে একটা পিণ্ডোরার বাক্স। মাঝখানে একবার শোনা গিয়েছিল, শিক্ষা কমিশন বাইশজন

সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এও এক অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার। ইতিপূর্বে বাইশজন সদস্য নিয়ে শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা কোন দেশেই বোধকরি শোনা যায় নি। এ করা হলে এটাও হবে আমাদের আর এক বিশ্ব রেকর্ড। বৃটিশ আমলে সারা ভারতের জন্য যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, যাকে চেয়ারম্যানের নামানুসারে স্যাডলার বা ব্যাপক অর্থে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' বলা হতো, তাতে স্মরণ হয়, পাঁচ কি ছ'জন মাত্র সদস্য ছিল। কমিশন যত বড় হবে, বলাবাহুল্য, কাজও তত কম হবে।

॥ ঘ ॥

এই যে দেশব্যাপী নকল করে পাস করার এক মহামারী শুরু হয়েছে তার জন্যও কি সরকার দায়ী নয়? এ ব্যাপারে সরকার কি কিছু-মাত্র কঠোরতার পরিচয় দিয়েছেন? নকল ধরতে গিয়ে কত শিক্ষক নাজেহাল হয়েছেন, হয়েছেন অপমানিত ও পর্যুদস্ত, এমন কি মার পর্যন্ত খেয়েছেন, সরকার কি কখনো এ সব শিক্ষকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, এঁদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা কি করেছেন? বরং ছাত্ররা যখন আবদার করছে সরকার তাই ত মেনে নিয়েছেন বার বার। স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে তিন বছর ধরে যে সব ছাত্র নকল করছে, নকল ধরা পড়ে যথারীতি দণ্ডিত হয়েছে, একদল ছাত্রের আবদারে বা হুমকিতে সরকার কি তাদের সকলের দণ্ড মওকুফ করে দেননি? সরকারের জানা উচিত, খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা আর আদর্শবাদী সংগ্রামী ছাত্ররা কখনো নকল করে পাস করতে চায় না। ঐ চোরাপথে পাস করতে চায় ভুয়াছাত্র আর ভুয়া-মুক্তিযোদ্ধারাই। অধিকন্তু কোন মুক্তিযোদ্ধা কিংবা দেশ-কর্মীই ছাত্রদের নকল করে পাস করার অধিকার দেয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্ততঃ কোন সরকারই শিক্ষা সম্পর্কীয় বিধি-বিধান আর নীতি-ধর্মকে বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়। এ সবকে বিসর্জন দিয়ে নকলবাজ ছাত্রদের প্রাপ্য দণ্ড পাইকারীভাবে মওকুফ করে দেওয়ার সাক্ষাৎ পরিণতিই ত আজ আমরা সারা দেশেই দেখতে পাচ্ছি। কোন কোন কলেজে নকলের অধিকার দাবি করে পোস্টার

দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে শ্লোগান, বের করা হয়েছে মিছিল, ফোটানো হয়েছে গ্রেনাইড। পরীক্ষা তদারকী শিক্ষক-অধ্যাপকরা ভয়ে থরহরি কম্পমান। দেখেশুনেও সরকার এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়-তদারকী শিক্ষক-অধ্যাপকদের সাহায্যে সরকার ও সরকারী প্রশাসন এতটুকু এগিয়ে আসে নি। এবারকার বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে না নকলের প্রতাপ আর দিগন্ত কতখানি প্রসারিত? এ সম্বন্ধে সরকার একদম খামোস, এ বিষয়ে তাঁদের যেন করণীয় কিছুই নেই! এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশ পাস করা লোকে ভরে যাবে সত্য ঘরে ঘরে ম্যাট্রিক পাস, আই.এ., বি এ., এম.এ. পাসও যে দেখা যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তখন কিন্তু সত্যিকার শিক্ষিত লোক হয়তো একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না সারা দেশে। দেশকে এ অবস্থায় ঠেলে দেওয়ার জন্য কাকেও যদি দায়ী করতে হয়, আমরা সরকারকেই ত দায়ী করবো। শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে সাধারণ আইন আর শৃঙ্খলা রক্ষা অপরিহার্য তা রক্ষা আর প্রয়োগের জন্য সরকার এ যাবত কোথাও কোন ব্যবস্থা নিয়েছে বলে শোনা যায় নি। এর নাম দেশ শাসন নয়। দেশ শাসনের জন্য প্রয়োজন শাসকদের কিছুটা মেরুদণ্ড, দূরদর্শিতা, কল্পনা-শক্তি, দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আর তাকে বাস্তবায়নের চারিত্রিক দৃঢ়তা। এ সব গুণ দেখতে পাচ্ছি না বলেই আমাদের দুঃখের পেয়ালা আজ ভরে উঠেছে। দেশ আর দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সত্যিকার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জনপ্রিয়তা সন্ধান তেমন কিছুমাত্র গৌরবের জন্য নয়। দেশ আজ দুর্বল, ছাত্র-শ্রমিকদের ভয়ে কম্পমান, তেমন জনপ্রিয় সরকার চায় না, চায় দক্ষ সরকার যার ইংরেজী এফিসিয়েন্ট গভর্নমেন্ট। আমাদের বর্তমান সরকার দক্ষ তথা এফিসিয়েন্ট হোক, এ আমাদের আন্তরিক কামনা। তা হওয়ার সব রকম সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এ সরকারের—এমন জনপ্রিয় নেতা, এমন সুগঠিত দল, এমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইতিপূর্বে কোন সরকারেরই ছিল না। তবুও কেন এ নৈরাজ্য বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে?

হুমায়ুন কবীরের হত্যা-প্রসঙ্গে কয়েকটি জিজ্ঞাসা

প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কনিষ্ঠতম অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর নিহত হয়েছেন। একটি সম্ভাবনাময় জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছে এক বা একাধিক আততায়ীর নিষ্ঠুর হাত। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনায় হুমায়ুনের মৃত্যু হলে, তাঁর পরিবার-পরিজন আর বন্ধু ও হিতৈষীদের পক্ষে এ শোক হয়তো কিছুটা সহনীয় হতো। কিন্তু তা তো নয়। এ হত্যা যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে সে বিষয়ে বোধ করি সরকার ও জনসাধারণ কারো মনে দ্বি-মত নেই। তবুও এ সম্পর্কে অর্থাৎ এ হত্যাকাণ্ডের রহস্য-উদ্‌ঘাটন আর আততায়ীদের খুঁজে বের করার জন্য তেমন কোন উদ্যোগ সরকার বা সমাজ একক বা যৌথভাবে গ্রহণ করেছে বলে মনে হয় না। অন্তত তেমন কোন প্রমাণ কাগজে-কলমে আমরা এ যাবত দেখিনি। বরং একটা ঔদাসীন্যই যেন সর্বত্র লক্ষিত। হয়তো এ ধরনের অন্যান্য হত্যার মতো এ হত্যাও বিস্মৃতির আঁধারে হারিয়ে যাবে আর কয়েক দিনের মধ্যে। রাষ্ট্র বা সমাজ কারো পক্ষে এ প্রশংসার কথা নয়।

এ হত্যা-প্রসঙ্গে আমার মনে যে কটি প্রশ্ন জেগেছে তা আমি তুলে ধরছি পাঠকদের সামনে :

১। হুমায়ুনকে কোন অশিক্ষিত চোর-ডাকাত বা লুটতরাজকারী হত্যা করেনি। হত্যা করেছে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচিত আর শিক্ষিত জনেরাই। শুনেছি, হুমায়ুনের নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ ছিল আর সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সোচ্চার। এ হত্যার পেছনে অর্থলোভ ছিল না, এ প্রায় ধরে নেওয়া যায়। মনে হয় মতবাদের সংঘর্ষই এ হত্যার

প্রধান কারণ। কাজেই কার সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের মিল আর কার বা কাদের সঙ্গেই মতাদর্শে তাঁর বিরোধ ছিল তা তাঁর পরিচিত আর ঘনিষ্ঠ মহলের না জানা থাকার কথা নয়। সে সব মহলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না? করা হয়ে থাকলে কি উত্তর পাওয়া গেছে?

২। হুমায়ুনের স্ত্রী উচ্চ শিক্ষিতা। স্বামীর মতাদর্শ আর এ নিয়ে কার সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য আর কার সঙ্গেই-বা তাঁর মতবিরোধ ছিল—এ সম্বন্ধে তিনি একদম ওয়াকিফহাল নন তা ভাবা যায় না। যে বা যারা তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছে তারা তাঁদের বাসা চেনে আর তাঁর স্বামীর পরিচিত। তা না হলে অর্থাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর না হলে ওদের ডাকে স্রেফ গেঞ্জি গায়ে হুমায়ুন বেরিয়ে পড়তেন না ঘর থেকে। আর তখন রাত নাকি মোটে আটটা থেকে সাড়ে আটটা—কাজেই ঐ সন্ধ্যারাতে হুমায়ুনের স্ত্রী এবং অন্য কেউ থাকলে তাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার কথা নয়। এবং আততায়ীদের কণ্ঠস্বর অন্যদেরও কানে যাওয়ার কথা। এ হত্যা সম্পর্কে হুমায়ুনের স্ত্রী বা ঐ বাসার অন্য কারো বিবৃতি আমার চোখে পড়েনি। তাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন কি? আততায়ীরা নাকি (যে কোন আততায়ী বা দুষ্কৃতকারী) সাংবাদিক থেকে পুলিশ সবাইকে ভয় দেখিয়ে থাকেন, দিয়ে থাকেন নানা রকমের হুমকি—এ ঘটনার বেলায়ও তা ঘটেনি তো? সে কারণেই কি, যাঁরা কিছু জানেন বা বলতে পারেন তাঁরাও ভয়ে চুপ মেরে আছেন?

৩। আশ্চর্য, এ ব্যাপারে এ যাবত কাকেও নাকি গ্রেফতার করা হয়নি। তার মানে এ নয় যে নিরপরাধ লোককে গ্রেফতার করে হয়রানি করা হোক। যাদের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তাদের গ্রেফতারের কথাই বলা হচ্ছে, যেমন এম. সি. এ. গফুরের বেলায় করা হয়েছে। ঠিকমতো গ্রেফতার করা গেলে এদের কাছ থেকেই অনেক সময় প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান মেলে।

৪। আশ্চর্যের বিষয়, হুমায়ুনের নাকি পোস্টমর্টেমও হয়নি! কেন? পোস্টমর্টেম করতে কে বা কারা বাধা দিলে? আমরা জানি, এরকম ক্ষেত্রে

পোস্টমর্টেম করা আইনানুসারে আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক। আত্মীয়স্বজন বা অন্য কেউ বাধা দিলে বা নিষেধ করলে পুলিশ বা ডাক্তার তা শুনতে বাধ্য নয়। হত্যা সম্বন্ধে যেখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, সেখানে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই পুলিশের এক্তেয়ারে চলে যায়। তখন আত্মীয় বা হিতৈষীদের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার থাকে না। হুমায়ুনের বেলায় এ অধিকার কে বা কারা প্রয়োগ করলো? তদন্তকারী পুলিশই বা তা শুনতে গেলেন কেন? পোস্টমর্টেম হলে বেশী কিছু মূল্যবান 'আলামত' যে জানা যেতো তাতে সন্দেহ নেই। তাই সমস্ত তদন্ত ব্যাপারটিই কিছুটা যেন গোলমেলে হয়ে গেছে বলে মনে হয়। এর জন্য কে বা কারা দায়ী?

৫। সুখের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু এ হত্যাকাণ্ডের তদন্তের আদেশ দিয়েছেন। অনেক সময় আদেশ আদেশই থেকে যায়। আশাকরি এ ব্যাপারে তা হবে না—পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তই হবে। আমার তৃতীয় জিজ্ঞাসার উত্তরটাও আশা করি এ তদন্তের আওতায় আসবে। আর এও আমাদের আন্তরিক আশা, তদন্তশেষে, তদন্তের ফলাফল জনগণকে জানানো হবে। অন্ততঃ একটা প্রেস-নোট আমরা আশা করবো তদন্তকারীদের কাছ থেকে। জহীর রায়হানের হত্যা বা নিখোঁজ হওয়া সম্বন্ধে এ যাবত সরকার কোন প্রেস-নোট বের করেননি। অপরাধীদের খুঁজে বের করার তৎপরতা কিংবা প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে জনসাধারণ আজও অন্ধকারে রয়ে গেছে। ফলে জনগণের মনে একটা চাপা ক্ষোভ বিরাজ করেছে আজ পর্যন্ত। হুমায়ুনের বেলায়ও কি তাই হবে?

৬। অতীতে বৃটিশ আমলে, সামরিক শাসনের আমলে পাকিস্তানেও এরকম ঘটনায় হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেওয়া বা সন্ধান দেওয়ার জন্য মোটা রকমের পুরস্কার ঘোষণা করা হতো। তাতে অনেক সময় সুফল পাওয়া গেছে। পুরস্কারের লোভে যোগসাজসকারীদের কেউ কেউ গোপনে এসে পুলিশকে খবর দিয়ে প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরার সুযোগ যে করে দিয়েছে, তার নজির বিরল নয়। বর্তমান সরকার বা আমাদের পুলিশ বিভাগ এ পরীক্ষিত নীতিটা গ্রহণ করেন না কেন?

৭। চাটগাঁয় বসে ঢাকা থেকে এমন অবিশ্বাস্য গুজবও আমরা শুনতে পাচ্ছি যে পুলিশ যথাযথভাবে এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে পদে পদে বাধা পাচ্ছে। কারণ খুব ক্ষমতা আর প্রতিপত্তিশালী কারো কারো ছেলে নাকি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে, তদন্ত হলে তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তা যদি সত্য হয় তাহলে এর চেয়ে দুঃখ আর হতাশার বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমাদের সরকার আর সরকারী মুখপাত্ররা অহরহ আইন ও আইনের শাসনের কথা বলেছেন, আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং একজন বিচারপতি, মন্ত্রিসভার সদস্যদের অর্ধেকেরও বেশী আইনজীবী। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী অন্য কোন দেশের ভাগ্যে কখনো জোটেনি, এ অবস্থায়ও যদি দেশে আইন ও আইন প্রয়োগকারী শক্তি স্বাধীনভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?

— —

সমাজতন্ত্রের পথ ও পাথেয়

বাংলাদেশের অন্যতম মৌল নীতি সমাজতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য আর আদর্শ হিসেবে এটি গৃহীত আর ঘোষিত। প্রয়োজনের তাগাদায় আর ঘটনার চাপে এ গ্রহণ না করে উপায় ছিল না আমাদের। যে-কোন দরিদ্র দেশের পক্ষে, আজকের দিনে, সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন গতি নেই, নেই কোন পথও। জনগণের জীবন থেকে সার্বিক দারিদ্র্য দূর করে তাদের মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার এ হচ্ছে একমাত্র উপায়। কারণ সমাজতন্ত্র শ্রেণী স্বীকার করে না, স্বীকার করে না ধনভিত্তিক বা ব্যবসাকেন্দ্রিক গোষ্ঠী। ফলে দেশের সম্পদ কিংবা রাষ্ট্রীয় শক্তি মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগ নেই এতে। সব দারিদ্র্যের মূল কেন্দ্রীভূত সম্পদ—ধনতান্ত্রিক সমাজ তথা পুঁজিবাদের ভিৎ যার উপর রচিত। ধনতন্ত্র শুধু যে সব রকম দারিদ্র্যের মূল তা নয়, একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে পৃথিবীর যাবতীয় অনর্থের জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে আরম্ভ করে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি সব কিছুর গোড়ায় রয়েছে পুঁজিবাদ এবং তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ। আমাদের চোখের সামনে এ শতাব্দীতে যে দু-দুটা মহাযুদ্ধ ঘটে গেল, যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছে নিহত ও বিকলাঙ্গ আর কোটি কোটি টাকার সম্পদ হয়েছে বিনষ্ট, একটুখানি সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখলেই দেখা যাবে স্রেফ পুঁজিবাদী স্বার্থ আর ঐ স্বার্থজাত দ্বন্দ্ব ছাড়া এর পেছনে অন্য কোন কারণ ছিল না। আজ আমেরিকা ভিয়েতনামে যে বীভৎস নরহত্যা আর ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে তাও কি এ একই কারণে নয়? মানবতার বিরুদ্ধে এমন জঘন্য অপরাধ একমাত্র পুঁজিবাদী দেশেই করতে পারে, করে থাকে।

ধনই ধনতন্ত্রের মক্কা, তাই ধনের জন্য অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক স্বার্থের খাতিরে এরা করতে পারে না হেন দুষ্কর্ম নেই পৃথিবীতে। মানবতা, মানবিক মূল্যবোধ, সত্য, ন্যায়, সুবিচার কিছুই আমল পায় না ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পিছনে কোন কারণ কিংবা যুক্তি আমেরিকান সংবুদ্ধিজীবীরাও খুঁজে পায়নি। ক্ষীণকণ্ঠে হলেও তাঁরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার।

এভাবে প্রতিটি যুদ্ধের কারণ সন্ধান করলে দেখা যাবে পুঁজিবাদ তথা ধনলিপ্সাই হচ্ছে এসব যুদ্ধের মূল উৎস ও প্রেরণা। ধনতন্ত্রের কাছে মানুষ তুচ্ছ, ধনই 'সবার উপরে সত্য'—তাই মানুষকে অকাতরে বলি দিতে ধনতন্ত্রের বাধে না। ভিয়েতনামে শুধু ভিয়েতনামীরা মরছে না, মরছে হাজার হাজার আমেরিকান তরুণও। তবুও টনক নড়ছে না আমেরিকার ধনবাদী শাসকদের। একমাত্র ধনই যে-ব্যবস্থায় মোক্ষ সেখানে এ না ঘটে পারে না। ধন নিরেট জড় বস্তু, তাই তাতে হৃদয়ের কোন স্থান নেই, মানবিক অনুভূতির অনুপ্রবেশ তাতে নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশ দরিদ্র, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গরীব। দীর্ঘদিনের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী—এ ব্যবস্থার অভিশাপের সাথে, তার নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রতিটি বাঙালীই হাড়ে হাড়ে পরিচিত। বাংলাদেশ সুজলা-সুফলা ও শস্য শ্যামলা, এ শুধু কাব্য নয়, বাস্তব সত্য। বাংলার মাটি উর্বরা, এর অধিবাসীরা পরিশ্রমী, বহু বৃহৎ শিল্পের কাঁচামাল এখানেই হয় উৎপন্ন। তবুও এদেশের অধিকাংশ মানুষের দু'বেলা পেটের ভাত জোটেনা, অনেকের সারাটা জীবন কাটে অর্ধনগ্ন অবস্থায়, অনেকের ভাগ্যে জোটেনা প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগটুকু। এখানকার বৃহত্তর জনতা বঞ্চিত থাকে লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা থেকে। মানবিক অধিকার বলতে যা বুঝায় তার সব কটাই এদেশের অধিকাংশ মানুষের আয়ত্তাতীত। এতকালের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এ সুজলা, সুফলা দেশকে এ অবস্থায় পরিণত করেছে। ইংরেজ আমলে এদেশের ধন ও এদেশের উৎপন্ন সম্পদের মোটা অংশ বিদেশে তথা ইংল্যাণ্ডে চালান হতো, পাকিস্তান আমলে তা চালান হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে জনগণের উৎপন্ন সম্পদ জনগণের ভোগে এবং প্রয়োজনে লাগতো না—তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকদীপ্ত এ বিংশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশের

মানুষ রয়ে গেছে যে তিমিরে সে তিমিরেই। বরং দারিদ্র্যের অন্ধকার ক্রমাগত তাদের আরো বেশী করে যেন ঘিরে ধরেছে। জীবন ধারণের অপরিহার্য বস্তুর মূল্যমান এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে আকাশচুম্বী—আজ তা অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে। একদিন সোভিয়েত রাশিয়ারও এ অবস্থা ছিল, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল আমাদের চেয়েও শোচনীয়। ঐ সময় ওদেশের কৃষক সমাজ ছিল বড় বড় ভূ-স্বামীদের ক্রীত-দাসের মতোই যাদের বলা হতো সার্ফ। জমির উপর তাদের ছিল না কোন অধিকার, পারতো না ওরা কিছু বলতে বা দাবি করতে সরকারের নিকট—তখন দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতা ছিল সর্বব্যাপক। সারা য়ুরোপে রাশিয়া ছিল সেদিন সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ। আজ সে সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বের সর্বাগ্র দেশ—সব দেশের চেয়ে উন্নত, সব দিকে সমৃদ্ধ। এবং গত বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা গেছে সবচেয়ে শক্তিশালীও।

আমেরিকাকে সবচেয়ে ধনী দেশ বলে অভিহিত করা হয়। হয়তো কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু এ ধন জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সঞ্চারিত নয় ওদেশে। এর স্রোত প্রবাহিত হয় না প্রতিটি আমেরিকান নাগরিকের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত। পৃথিবীর বৃহত্তম পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে এর ধন-সম্পদও পুঁজিপতি তথা বড় বড় শিল্পমালিক আর ভূ-স্বামীদেরই করায়ত্ত আর তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারাই ভোগ করে এর ষোল আনা সুযোগ সুবিধা।

অসীম বিলাস আর অপরিমিত প্রাচুর্যের পাশে পাশে ওখানে দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতাও রয়েছে। নিগ্রোদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার আর নির্যাতন আজ অত সমৃদ্ধ আর উন্নত দেশের জন্য এক বিরাট কলংকের দাগ হয়ে আছে। নিগ্রোদের অবস্থা অবর্ণনীয়। বর্ণবৈষম্য ও ধনবৈষম্যেরই এ পরিণতি। ধনবৈষম্যেই ডেকে আনে ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ আর যত সব দ্বন্দ্ব ও বিরোধ। মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদও সৃষ্টি হয় এ ধনবৈষম্যেরই ফলে। শ্রেণী থাকলে শ্রেণী বিদ্বেষ অনিবার্য। তাই সমাজতন্ত্র সর্বাগ্রে ধনবৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। ধন-বৈষম্য দূর হলে অন্য সব বৈষম্যও স্বাভাবিক নিয়মেই দূর হতে বাধ্য। তখন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় সহজ ও ত্বরান্বিত। আমাদেরও এ

পথেই অগ্রসর হতে হবে। এ পথে অগ্রসর হয়ে, আমাদের চেয়েও অনুন্নত এক কালের সোভিয়েত রাশিয়া আজ বিশ্বের সেরা রাষ্ট্রে পরিণত। আজ ওখানে কোন নিরক্ষর কি অভাবগ্রস্ত নেই, নেই কোন রুগ্ন কিংবা ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষ। সামাজিক অপরাধ ওখানে নেই বললেই চলে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সম্পদে-প্রাচুর্যে, সাহিত্য ও শিল্পকলায় আজ সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সমাজতন্ত্রের পথে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার ফলেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আজ ওখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। অসংখ্য জাতি অধ্যুষিত ও বিচিত্র ভাষাভাষী মানুষকে নিয়ে এ এক অসাধ্য সাধন। বর্ণ-বিরোধ, জাতি-বিরোধ, ভাষা-বিরোধ সব কাজ ওখানে নিশ্চিহ্ন।

বলেছি আমেরিকাও প্রাচুর্যের দেশ কিন্তু এ প্রাচুর্য সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত বলে সমাজদেহে বহু রকম বিকৃতির বিষবীজ তা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমেরিকান সমাজদেহ সুস্থ নয় একথা আমেরিকার বুদ্ধিজীবীরাই আজ স্বীকার না করে পারছেন না। সব রকম অপরাধ আজ ওখানে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা ওখানে আজ এক ভয়াবহ ব্যাধি হয়ে দেখা দিয়েছে। যে-কোন উৎসব দিনে স্রেফ মদ খেয়ে মাতলামি করেই শত শত নয় কয়েক হাজার মানুষ মারা যায় প্রতি বছর ঐ দেশে। এসব তথ্য সংবাদপত্র পাঠকদের অজানা নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে একি কখনো কল্পনা করা যায়? সোভিয়েতে সব চেয়ে বড় উৎসব রেড স্কোয়ারে মে দিবসের উৎসব। ঐ দিন কয়েক লক্ষ লোক ওখানে জমায়েত হয়, উৎফুল্ল জনতার সে কি আনন্দ কলরব, জীবনের সর্বস্তরের মানুষের সে কি সুশৃঙ্খল আর সুসজ্জিত মিছিলের পর মিছিল। এবারকার উৎসব আমার স্বচক্ষে, রেডস্কোয়ারে দাঁড়িয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে। কই, একটা লোকও মারা গেছে কি আহত হয়েছে বলে ত শোনা যায়নি। দেখলাম না ত এতটুকু হুড়োহুড়ি কিংবা ঠেলাঠেলি, জনতার ভিড়ে হাতাহাতি অথবা মাতলামি। অথচ মদ ত সেখানেও 'জায়েজ' পানীয়। ওদের জাতীয় পানীয় ভদ্কা খুব কড়া মদ্য বলেই ত পরিচিত। কিন্তু পথে-ঘাটে হোটেলে-রেঁস্তোরায় কিংবা

স্কোয়ারের এই বিরাট জনতার কোথাও ত একটা মদ-মাতাল চোখে পড়ল না।

সমাজতন্ত্রের এক নাম শৃংখলা। শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সর্বত্র এবং সর্বব্যাপারে শৃঙ্খলা চাই। উচ্ছৃঙ্খল জনতা, সে শিক্ষিত কি অশিক্ষিত যাই হোক কখনো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে না।

সমাজতন্ত্র স্বভাবতঃই যুদ্ধবিরোধী। কারণ যুদ্ধ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। কিন্তু প্রয়োজন হলে, অর্থাৎ আক্রান্ত হলে সমাজতন্ত্র তথা সমাজতান্ত্রিক দেশ কি চুপ করে থাকবে, যুদ্ধ করবে না? আলবৎ করবে। আত্মরক্ষার জন্য, সমাজতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হলে সমাজতন্ত্র যুদ্ধ করবে বই কি। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার বাহিনী অতর্কিতে সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করেছিল। সমাজতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই ছিল হিটলারের উদ্দেশ্য। হিটলার য়ুরোপীয় পুঁজিবাদের প্রতিভূ শুধু নয়, বরং বলা যায় ঐ পুঁজিবাদের এক বিকৃত মস্তিষ্ক সন্তান। তাই তাঁর দানবীয় তাণ্ডবের হাত থেকে সেদিন বহু উদার পুঁজিবাদী দেশও রক্ষা পায়নি। সমাজতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করতে না পারলে পৃথিবীতে তাঁর কট্টর পুঁজিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব হবে না, তাই হিটলার তার সমস্ত সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সোভিয়েতের উপর। কিন্তু সমাজতন্ত্র যে কত বড় শক্তির উৎস এ সত্য হিটলারের জানা ছিল না। য়ুরোপবিজয়ী হিটলার প্রথমবারের মতো সমাজতন্ত্রের এ দুর্জয় স্তম্ভে এসে পেলো ধাক্কা, পেলো প্রচণ্ড বাধা। সোভিয়েতের কয়েক লক্ষ সমাজতন্ত্রী বীরসৈনিক এক লেনিনগ্রাড রক্ষা করতে গিয়েই অকাতরে শহীদ হলেন, তবুও সমাজতন্ত্রের জনক লেনিনের স্মৃতিবিজড়িত নগরের সূচ্যগ্র ভূমিও দিলেন না শত্রুর পদানত হতে। মাতৃভূমি আর সমাজতন্ত্রের প্রতি এ বীর শহীদদের যে ভালোবাসা আর আত্মত্যাগ তা ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

হিটলারের পরাজয় মানে পুঁজিবাদের পরাজয়, সোভিয়েতের জয় মানে সমাজতন্ত্রের জয়। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

পর থেকে পুঁজিবাদের অবক্ষয় শুরু হয়েছে সর্বত্র আর সমাজতন্ত্র সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে। আমাদের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পুঁজিবাদের প্রতিভূ, এহিয়া-টিক্কাও হিটলারের চেয়ে কিছুমাত্র কম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়নি। তাঁদের ধ্বংসযজ্ঞও কম ভয়াবহ ছিল না। এবং তাদের পরাজয়ও হিটলারের পরাজয়ের চেয়ে কম অবমাননাকর নয়। তবে মনে হয় হিটলারের যেন কিছুটা আত্মসম্মান বোধ ছিল। তাই তিনি আত্মহত্যা করে নিজের পরাজিত লজ্জিত মুখ দেশের মানুষকে দেখবার ভিক্তি থেকে বেঁচে গেছেন। আমাদের ক্ষুদে হিটলারদের সেটুকু আত্মসম্মান বোধও নেই।

গত যুদ্ধের পর সোভিয়েত জনগণ সমাজতন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে আরো বেশী করে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি তার পর থেকে সেখানে হয়েছে আরো জোরদার। তার অগ্রগতি নিয়েছে এক বিস্ময়কর রূপ। এবারকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর, বলা বাহুল্য আমাদের এ যুদ্ধও ছিল পরোক্ষভাবে এক নিষ্ঠুর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে— আমরাও আমাদের শক্তিকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি এবং সে সঙ্গে আবিষ্কার করেছি আমাদের আগামী দিনের সমাজ ব্যবস্থা হবে পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক। এ পথেই আমরা সমাজদেহ থেকে ধনবৈষম্য দূর করে এক শ্রেণীহীন, সুখী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারবো। এ ব্যাপারে আমাদের সামনে রয়েছে সোভিয়েতের আদর্শ। যে সোভিয়েত সংগ্রামের সময় যেমন তেমনি এ-পুনর্গঠনের সময়ও সর্বতোভাবে এগিয়ে এসেছে আমাদের সাহায্যে। বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী ইতিহাসের এক অনিবার্য পরিণতি।

স্বাধীনতার পরবর্তী ভূমিকা

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ভূমিকা আর স্বাধীনতার পরবর্তী ভূমিকা এক নয়, এক হতে পারে না। একটি সংগ্রামের, উত্তেজনা আর শত্রু নিধনের, অন্যটি নির্মাণ আর সংগঠনের। সুপরিকল্পিতভাবে দেশকে গড়ে তোলা, বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে সুস্থির আর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পরবর্তী ভূমিকার প্রধান লক্ষ্য। যুদ্ধ জয়ের চেয়েও এ লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিনতর। এর জন্য প্রয়োজন সুস্থ আর ঠাণ্ডা মাথা। এ সময় উত্তেজনা কিংবা যুদ্ধং দেহি মনোভাব অত্যন্ত মারাত্মক। স্বাধীনতা যদি আমাদের হৃদয়কে প্রশস্ত, উদার আর ক্ষমাশীল না করে তা'হলে স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে। আফ্রিকা আর এশিয়ার বহু দেশে তার নজির চেয়ে দেখলেই দেখা যাবে। তাই গোড়া থেকেই আমাদের হুঁশিয়ার হতে হবে এবং থাকতে হবে সতর্ক। এ স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির বৃহত্তর অংশ এক ভাবে না একভাবে অংশ নিয়েছে, যারা সম্মুখযুদ্ধে যেতে পারেনি, ভিতরে থেকে তারাও কম ত্যাগ স্বীকার করেনি। অনেকে আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের গোপনে সাহায্য করেছে, দিয়েছে আশ্রয়, দিয়েছে খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ-পত্র। অনেকে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে, অনেকে নানাভাবে নির্যাতন ভোগ করেছে জল্লাদদের হাতের গোলাম 'রাজাকার' আর বানর তথা 'বদর বাহিনীর' হাতে। এ নির্যাতন যে কত ভয়াবহ আর নির্মম তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। তাই যারা সীমান্ত পেরিয়ে সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে অংশ নেয়নি বা নিতে পারেনি, স্বাধীনতা অর্জনে তাদের কোন দান নেই এ কথা মনে করা হলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। সারা বাংলাদেশই যুদ্ধের অংশীদার, সারা বাংলাদেশই যুদ্ধে বিধ্বস্ত। মুক্তিবাহিনীর বিজয় যে এত সহজে হয়েছে তার কারণ দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃ-

স্ফূর্ত সহযোগিতা। কিছু সংখ্যক লোক যে স্বাধীন বাংলার বিরোধিতা করেনি তা নয়, তাদের মধ্যে যারা বাড়াবাড়ি করেছে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে চেয়েছে নিশ্চয়ই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সে শাস্তি দেওয়ার মালিক বাংলাদেশ সরকার। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে যথাযথ বিচার করে যার যে দণ্ড প্রাপ্য সরকার নিশ্চয়ই সে দণ্ড তাকে দেবে। এ বিষয়ে সরকার ইতিমধ্যেই তার নীতি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছে। তাই কোন অবস্থাতেই নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া সৎ নাগরিকের উচিত নয়। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে মানি, স্বীকার করি, আমাদের সর্বাত্মক আনুগত্য রয়েছে এ সরকারের প্রতি। এ আনুগত্যের উপর আমাদের স্বাধীনতাই শুধু নয়, আমাদের অস্তিত্বও নির্ভরশীল। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র ধরতে গেলে এখনও সদ্যোজাত শিশু। একে সযত্নে লালন-পালন করে বড় আর শক্ত করে তুলতে হবে, এতে প্রত্যেক নাগরিককে মেলাতে হবে হাত। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শান্তি আর শৃঙ্খলা। স্বাধীনতা এক অপার্থিব সম্পদ, গত চব্বিশ বৎসর এ সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলাম – আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী ভারতীয় যোদ্ধাদের সহযোগিতায় সে স্বাধীনতা-সম্পদ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। হিংসা, বিদ্বেষ, বিরোধ, দলাদলি কিংবা প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে এ স্বাধীনতা ধনকে আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না। আজ আমরা তাকাবো উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পানে। উর্দু, বাংলা, সিন্ধি, বেলুচি, গুজরাটি, পশ্তু যার যে ভাষাই হোক সবাইকে আজ আমরা দুই হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেব। বলবো ঃ যে যেভাবে পার স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ে তোল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারখানা, সব কিছুকে আজ অগৌণে চালু করতে হবে। এ সবের মালিক, পরিচালক যেই হোক এ সবই আজ বাংলাদেশের সম্পদ। এ সবকে চালু করা ও চালু রাখার উপর আমাদের অর্থনীতি আর জাতীয় সম্পদ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। সোনার বাংলা আজও দরিদ্র আর বেকারের দেশ। এসব দূর করতে হলে ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, শিল্প-কারখানা, যানবাহন, সব কিছুকে পুরোদমে চালু রাখতে হবে। তারজন্য সর্বাগ্রে চাই শান্তি

ও শৃঙ্খলা, আইন আর আইনের শাসন। তা'হলেই সোনার বাংলা সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলা হয়ে উঠবে অচিরেই। এ দেশের সব মানুষ ভাই ভাই। মনে রাখতে হবে ভাইয়ের রক্তপাত হারাম, ভাইয়ের ধন-সম্পদ অপহরণ করা হারাম। ভাইয়ের ইজ্জত-সম্ভ্রম নষ্ট করা হারাম। যুদ্ধ আর সংগ্রামের হাতিয়ার বন্দুক বেয়নেট বটে কিন্তু রাষ্ট্র গঠন আর দেশ নির্মাণের হাতিয়ার প্রেম, ভালোবাসা, ক্ষমা, সহনশীলতা, সহযোগ আর সহযোগিতা। যুদ্ধে আমরা চূড়ান্ত বিজয়ে-বিজয়ী। এখন আমরা বন্দুক, বেয়নেট দূরে ছুঁড়ে ফেলবো; তুলে নেবো প্রেম, ভালবাসা, ক্ষমা আর সহনশীলতার হাতিয়ার - এ হাতিয়ার দিয়েই আমরা গড়বো সোনার বাংলা। আমাদের সরকার, জনসাধারণ, মুক্তিবাহিনী আর গেরিলাদের এবং আমাদের সকলের আজকের দিনে এ হোক সংকল্প।

———

ভাষার সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা

সমাজতন্ত্র আজকের দুনিয়ায় সব চেয়ে চলতি কথা। সমাজতন্ত্রে যারা বিশ্বাসী নয় তারাও সমাজতন্ত্রকে ভুলে থাকতে পারছে না আজ। অন্ততঃ নিন্দা করার জন্য হলেও সমাজতন্ত্রের নাম তাঁরাও নিয়ে থাকেন। সমাজতন্ত্রের পেছনে এমন এক দুর্বার আর অপ্রতিরোধ্য শক্তি রয়েছে যে—শত্রুমিত্র কারো পক্ষেই সমাজতন্ত্রকে উপেক্ষা করা বা সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। সম্ভব না হওয়ার বড় কারণ সমাজতন্ত্র সর্বতোভাবে মানবিক—মানবিক অনুভব-অনুভূতি আর নীতি ধর্মের সঙ্গে এর রয়েছে পুরোপুরি সামঞ্জস্য। এ যদি মানব-স্বভাবের বিরোধী হতো তা হলে সারা বিশ্বের মানুষের মনে এ কিছুতেই এমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতো না। অমানবিক বহু মতবাদ আর আন্দোলন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—কিছুমাত্র অ-মানবিক হলে সমাজতন্ত্রেরও সে একই দশা ঘটতো। কিন্তু তা তো ঘটেনি, ঘটার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। বরং তার দ্রুত প্রসার ঘটে চলেছে পৃথিবীব্যাপী—আজ এমন কোন দেশ নেই যেখানে সমাজতন্ত্রের বাণী পৌঁছেনি। সাধারণ মানুষ আজ সমাজতন্ত্রের মধ্যেই যেন খুঁজে পেয়েছে তাদের মুক্তি সনদ।

এ হওয়ার সব চেয়ে বড় কারণ আসলে মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী। সামাজিক জীবন ছাড়া তার প্রকাশ আর বিকাশ সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্র মানে সুনিয়ন্ত্রিত আর সুষমভাবে পরিচালিত সমাজ—যে সমাজে অসম বণ্টন আর অন্যায়-অবিচার থাকবে না। সকলে লাভ করবে সম-সুযোগ আর সম-মর্যাদা। মানব-মর্যাদায় থাকবে না কোন ভেদাভেদ। মানবিক

ব্যাপারে মানুষ এক আর অচ্ছেদ্য এ বোধ থেকেই সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি। তাই যা কিছু মানবিক অর্থাৎ যা কিছু মানব-জীবন আর মানব সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সমাজতন্ত্র তাকে অস্বীকার করতে পারে না। ভাষার চেয়ে মানবিক আর কিছু নেই, একমাত্র মানুষই ব্যবহার করে থাকে ভাষা, যা তার ভাব বিনিময়ের প্রধানতম বাহন। এ ভাব-বিনিময়ের পথেই গড়ে উঠে সমাজ আর সামাজিক জীবন। তাই সমাজতন্ত্রেরও বড় হাতিয়ার ভাষা। তাই সমাজতন্ত্র তথা সমাজতান্ত্রিক ভাষাকে উপেক্ষা করতে পারে না, থাকতে পারে না ভাষার প্রতি কিছুমাত্র উদাসীন। ভাষাকে অবলম্বন করেই সব রকম ভাব আর চিন্তার বিকাশ ঘটে, গড়ে উঠে নিত্য-নতুন মতবাদ আর সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ে ভাষার মারফত। ভাষা ছাড়া সমাজ-জীবন অচল। যে আদিম সমাজ ভেদাভেদ, অবিচার আর অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে সমাজকে ছাড়িয়ে আমরাও এখন সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথা চিন্তা করছি। এ চিন্তা ভাষাবাহী হয়েই কর্মে রূপায়িত হবে। তাই আমাদের ভাষাকে শুধু ভাবের ভাষা হলে চলবে না তাকে কাজের ভাষাও হতে হবে, গড়ে তুলতে হবে কাজের ভাষা হিসেবে। একুশের শহীদরা প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে আমাদের ভাষাকে রক্ষা করেছে—দিয়েছে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা। এখন এ ভাষাকে সর্ব-কর্মের ভাষা করে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব আর কর্তব্য। স্রেফ আমাদের ভাষা যদি সর্বত্রগামী না হয় স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীতেই সীমিত হয়ে থাকে তা হলে এ ভাষা সামাজিক তথা সমাজতান্ত্রিক জীবনের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে। সমাজতন্ত্রে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের যথাযোগ্য স্থান রয়েছে, সে স্থান গ্রহণের যোগ্যতা তারা অর্জন করে ভাষা তথা মাতৃভাষার মারফত। তাই সমাজতন্ত্রে নিরক্ষরতার স্থান নেই। সমাজতন্ত্রের প্রথম শর্তই হলো সর্বাগ্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণ—তারপর মাতৃভাষার মারফত শিক্ষার আলো সমাজ দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া। সমাজতন্ত্রের

সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক তাই অত্যন্ত নিবিড়—সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে আমাদের ভাষাকেও সে ভাবে গড়ে তুলতে হবে। সমাজতন্ত্রে কোন মানুষ যেমন অবহেলিত নয়, তেমনি অবহেলিত নয় কোন কর্মও—তাই ভাষাকেও সব মানুষ আর সব কর্মের ভাষা হতে হয়। এবারকার একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমাদের ভাষাকে সে ভাবে গড়ে তোলার শপথ হোক আমাদের সকলের।

———

একুশের উত্তরাধিকার

যেখানে জীবনের দাবী আর প্রয়োজন সাক্ষাৎভাবে জড়িত সেখানে কোন আপস নেই। সেখানে জীবন দিয়েও জীবন-সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জীবন-সত্য মানে যা জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক, যা জীবন বিকাশের সহায়ক। ভাষা ছাড়া মানুষ মানুষ হতে পারে না। ভাষার সোপান পরম্পরা পার হয়েই আদিম বন্য মানুষ আজ সভ্য মানুষে পরিণত। তার আশা আর অভীপ্সা যে আজ চন্দ্র আর মঙ্গল গ্রহের অভিযাত্রী তার মূল উৎস-মুখ ভাষা। ভাষাকে আশ্রয় করেই মানুষের মন লালিত-পালিত ও বিকশিত। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম সব কিছুই ভাষা-আশ্রিত। ভাষা ছাড়া এ সবের জন্ম এবং বিকাশ কিছুতেই হতো না।

তাই ভাষার দাবি জীবনের দাবি, মনুষ্যত্বের দাবি। এ দাবির সংগ্রামে মানুষ কিছুতেই এবং কখনো নতি স্বীকার করতে পারে না। আমরা তথা আমাদের তরুণরাও তাই নতি স্বীকার করেনি। তারা জীবন দিয়েই জীবন প্রতিষ্ঠা করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারী সেই প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন তাই আমাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বাঙালী জাতির এ এক শাশ্বত উত্তরাধিকার। এ উত্তরাধিকারের জন্য আমরা একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদদের কাছে ঋণী।

একুশের তরুণদের এ ঋণের দায়-দায়িত্ব বুঝতে আর উপলব্ধি করতে হবে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আমাদের ভাষা সাহিত্যের প্রতি আমাদের কর্তব্য আর দায়িত্ব অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এ ভাষাকে এখন সর্ব কর্মের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। জীবনের সর্বস্তরে এখন এর সম্প্রসারণ অনিবার্য। শুধু কথা আর বুলি দিয়ে একটা ভাষা আর সাহিত্যকে গড়ে তোলা যায় না—তার জন্য চাই কঠোর শ্রম, একাগ্র-নিষ্ঠা আর অনলস সাধনা।

সে সঙ্গে প্রয়োজন নিজের ভাষা আর সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, তার সম্প্রসারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে সরকারের যেমন তেমনি জনগণেরও রয়েছে দায়িত্ব। সরকারের চেয়েও জনগণের দায়িত্ব বরং বেশী। কারণ জনগণ যদি নিজের মাতৃভাষার বই না কেনে, না পড়ে, তা হলে ভাষা আর সাহিত্যের সমৃদ্ধি কিছুতেই হতে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশের এ প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারীর মহান দিবসে সকলের বিশেষ করে তরুণদের সংকল্প হোক: "আমরা বাঙলা বই কিনবো, আমরা বাংলা বই পড়বো, দেখবো বাংলা ছবি।"

———

বইয়ের দোকানে বই পাওয়া যাবে না কেন?

আজ বাংলাদেশের হতভাগ্য ছাত্র আর অভিভাবকদের মনে এটাই সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের জবানীতে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগ নিজেদের অযোগ্যতা আর ব্যর্থতার যে সাফাই দিয়েছেন তাতে এ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নেই। 'দাম যাই হোক'। চালের দোকানে যদি চাল পাওয়া যায়, ডালের দোকানে যদি ডাল পাওয় যায়, তেলের দোকানে যদি তেল আর কাপড়ের দোকানে যদি কাপড় পাওয়া যায়, বইয়ের দোকানে বই পাওয়া যাবে না কেন? 'দাম যাই হোকে'র জন্য সরকারই ত দায়ী। দাম নিয়ন্ত্রণ আর তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব ত একমাত্র সরকারের। চাল, ডাল, তেল, নুন, লাকড়ি আর কাপড়-চোপড়, জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, ঐসবের সঙ্গে মানুষের বাঁচা-মরার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। স্বাধীনতার পর এসবের দাম তিনগুণ, দ্রব্যবিশেষে চারগুণ-পাঁচগুণ হয়ে গেছে, তবুও বইয়ের মতো সে সবের কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের মতো কেন গঠন করা হয়নি চাল বোর্ড, ডাল বোর্ড, তেল বোর্ড বা কাপড় বোর্ড? তাহলে ত মানুষকে ত্রিশ টাকার চাল আশি-নব্বই টাকায়, চার টাকার তেল চোদ্দ টাকায়, তিন টাকার লাকড়ি বারো টাকায় কিনতে হতো না। কেন খোলা হয়নি 'ইমার্জেন্সী কণ্ট্রোল রুম' এসবের জন্য? তাহলে মানুষ অন্ততঃ দুবেলা খেয়ে বাঁচার সুযোগ পেতো। বাঁচার অধিকার আদি ও প্রাথমিক অধিকার। বলাবাহুল্য বই না হলেও মানুষের চলে, লেখাপড়া না করলেও মানুষ মরে যায় না। কিন্তু খেতে না পেলে মরে। কথায় বলে নিজে বাঁচলে বাপের নাম অর্থাৎ মানুষ বেঁচে থাকলেই অন্যসব কিছু—শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদির যা কিছু মূল্য তখনই। যেখানে মরা-বাঁচার বস্তু-মূল্য তিন-চার গুণ হয়ে গেছে, সেখানে এক টাকা আর ষাট পয়সার

ব্যবধানের জন্ম এত মাথাব্যথা কেন? এ সামান্য ব্যবধানের জন্ম গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন একটা নৈরাজ্য স্থষ্টির কোন মানে হয় কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যতদিন বইয়ের দোকানে বই কিনতে পাওয়া যাবে না ততদিন এ নৈরাজ্যের অবসান ঘটবে না। বাংলাদেশের দূর দূর গ্রামে স্কুল রয়েছে, কাজেই ছাত্রও আছে কিন্তু 'সোনালী' কেন 'লোহালী' ব্যাংকেরও কোন অস্তিত্ব নেই ওসব জায়গায়। সুদূর পার্বত্য চট্টগ্রামের ফুলছড়ি কি সুখছড়ি স্কুল থেকে ঢাকার ৩৮ নং র‍্যাংকিন স্ট্রীটের ইমার্জেন্সী কণ্ট্রোল রুমে চিঠি লিখে যথা সময়ে বই পাওয়ার আশা এ ধরনের সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তেমন ভুক্তভোগীরা অন্তত: তা করতে যাবে না। গোদের উপর বিষফোঁড়া—তা নাকি করতে হবে মহকুমা হাকিমের মাধ্যমে! এরি নাম কি বিনামূল্যে বা অর্ধমূল্যে বই বিতরণ? মহকুমা হাকিম মানে এস.ডি.ও, জেলার প্রশাসকদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ। মহকুমা হাকিমের কাছে পৌঁছতে হলে তার আগে অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয়। অর্থাৎ আগে পেঁছতে হয় তার পেশকারের কাছে, পেশকারের আগে প্রবেশাধিকারের জন্ম 'খুশী' করতে হয় তাঁর পিয়নকে। 'খুশী' মানে সবারই জানা। পেশকারকেও যে 'খুশী' করতে হবে না তেমন কথা বলা যায় না। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় খাজনার চেয়ে বাজনার খরচ যে অনেক বেশী পড়বে এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন। আর তা যে চল্লিশ পয়সায় কুলাবে না তাতেও সন্দেহ নেই। ছেলেকে কি মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আপনি যেন ফৌজদারী মকদ্দমার আসামী বনে গেছেন এখন! বই বিতরণের এ ভোগলকী কাণ্ড নাকি করা হয়েছে শিক্ষাসম্প্রসারণের মহৎ উদ্দেশ্যে, আবার এ কাণ্ডকেই বলা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক।—সরকার নাকি 'সমাজতান্ত্রিক নীতিতে অবিচলভাবে আস্থাশীল'!

সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এ ধারণা নিয়ে এঁরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান! 'স্কুল টেক্স্ট বুক বোর্ড' আর তার মুরুব্বিরা এ সত্যটুকু বোধহয় জানে না, যে সমাজতান্ত্রিক দেশে শিক্ষা-বছরের শুরুতে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বই না পেঁছলে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয় অথবা

তাঁকে দেওয়া হয় সরিয়ে। আমার সুদীর্ঘ শিক্ষক-জীবনে বই কিনতে প্যারেনি বলে কেউ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে এমন কখনো দেখিনি বা শুনিনি। বরং দেখেছি স্কুল-কলেজের মাইনে দিতে প্যারেনি বলে, বা জায়গীর যোগাড় করতে কিংবা হোস্টেল-বোর্ডিংয়ের খরচ জোটাতে অপরাগ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে বা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেখেছি। উপরন্তু পুরোনো বই কিংবা ধার করা বই দিয়েও অনেককে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে দেখেছি। বইয়ের অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বর্তমানে সরকার সাহায্য বাবদ স্কুল-কলেজে বহু টাকা দিয়েছে, বিদেশী কোন কোন সরকার বা সংস্থাও সাহায্য দিয়েছে বিস্তর। এর একটা অংশ এক টাকা আর ষাট পয়সার ব্যবধান ঘুচানের জন্য অনায়াসে স্কুল-কলেজগুলোকে দেওয়া যেতে পারতো। তাহলেও অতি সহজে এ নৈরাজ্য এড়ানো যেতো। একখানা চিঠি লিখতেই আজকাল কুড়ি পয়সা লাগে, সরকারী কোন বিভাগে একখানা চিঠিতে কাজ হয়েছে তেমন নজির খুব কম। কাজেই সুদূর রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ইমার্জেন্সী কণ্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিংবা মহকুমা হাকিমের মাধ্যমে বই যোগাড় করতে ছাত্র আর তার অভিভাবকের যে বারোটা বেজে যাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বছরের মাঝখানে একটা বই যদি হারিয়ে যায় অথবা ঘর পোড়ায় পুড়ে যায় বইপত্র তখন কি দশা হবে? তখন কি মহকুমা হাকিমের দরবারীদের 'খুশী' করে ঢাকার 'ইমার্জেন্সী কণ্ট্রোল রুমে' ছুটতে কি লেখালেখি করতে জান বেরিয়ে যাবে না? তা করতে কত চল্লিশ পয়সার প্রয়োজন? ছাত্র বা অভিভাবকের সদরে যাতায়াত আর বই পাঠাবার ডাক খরচই-বা কে বহন করবে? তা কি বহু চল্লিশ পয়সাকে ছাড়িয়ে যাবে না? বলা-বাহুল্য, বইয়ের দোকানে বই কিনতে পাওয়ার ব্যবস্থা যতদিন না হচ্ছে ততদিন পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা-বিভাগ যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে কিছুতেই তার অবসান ঘটবে না। বিনামূল্যে বিতরণ মানে এক ধরনের ভিক্ষাদান, জাতীয় ভিত্তিতে এ প্রথা শুধু যে নিদারুণ জিল্লতী তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এক মায়ামরীচিকাও। এমন গ্রহণকারীদের জন্য তা একদিকে নিয়ে

জাগে অবমাননা অন্যদিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তা ডেকে আনে দুর্নীতি। 'লঙ্গরখানার' যুগেও এ অবস্থা আমরা দেখেছি, এখন সাহায্য বিতরণের বেলায়ও তা দেখতে পাচ্ছি। দোহাই জাতিকে ভিক্ষুকে পরিণত করবেন না।

সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিকে ভিক্ষার অন্নে বেঁচে থাকার জিল্লতী থেকে রক্ষা করুন। ত্যাগ করুন জাতিকে বিনামূল্যে কিছু দান করার মহৎ সংকল্প (!)। সব কিছু, বইপুস্তকসুদ্ধ দয়া করে ন্যায্যমূল্যে দেওয়ার উদ্যোগ নিন। তাতেই জাতি খুঁজে পাবে আত্মসম্মানের পথ। খুঁজে পাবে স্বনির্ভরতা। আত্মসম্মান আর স্বনির্ভরতার চেয়ে মহৎ লক্ষ্য এবং মহত্তর আদর্শ আর নেই। সমাজতন্ত্রেরও এ পথ আর এ লক্ষ্য। তাই সব সমাজতান্ত্রিক দেশে ভিক্ষাদান প্রথা আর ভিক্ষুক অনুপস্থিত। সম্প্রতি আমি সোভিয়েট রাশিয়া আর চেকোস্লোভাকিয়া দেখে এসেছি। কোথাও একটি ভিক্ষুক কি সাহায্যপ্রার্থী নজরে পড়ে নি। কোথাও কোন কিছু বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই ওসব দেশে। ব্যবস্থা রয়েছে সবকিছু কমদামে তথা ন্যায্যমূল্যে দেওয়ার বা বেচাকেনার। বেশী দাম নেওয়া তথা মুনাফাখোরী ঐসব দেশে ক্রিমিন্যাল অফেন্স। সমাজতন্ত্রের একটি বড় শর্ত সব কিছু জনগণের কাছে ন্যায্যমূল্যে পোঁছে দেওয়া। বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক সব সমাজতন্ত্রের এ লক্ষ্য।

কাজেই আমাদের সরকারের মহামান্য মুখপাত্রদের প্রতি আমাদেরও বিনীত অনুরোধ, অলক্ষ্য, অদৃশ্য ও অবাস্তব সমাজতন্ত্রের বুলি আর আউড়াবেন না। আপনাদের 'অবিচলিত আস্থাশীলতার' নমুনা আমরা এর মধ্যেই পেয়ে গেছি। জাতির প্রতি যদি আপনাদের কিছুমাত্র ভালোবাসা থাকে তাহলে অবিলম্বে দেশব্যাপী ন্যায্যমূল্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করুন। শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনাদের মনে যদি কিছুমাত্র দুর্ভাবনা থেকে থাকে তাহলে অবিলম্বে বইয়ের দোকানে বই তথা পাঠ্যবই পাওয়ার ব্যবস্থা করুন। অবশ্য ন্যায্যমূল্যে। বন্ধ করুন অতিরিক্ত মুনাফার পথ। 'ইমার্জেন্সী কণ্ট্রোল রুম' স্রেফ কতগুলো জটিলতার সৃষ্টি করবে তাতে কাজ হবে না একবিন্দুও। তার চেয়ে দাম কণ্ট্রোল করুন।

কণ্ট্রোল দামে বইয়ের দোকানে প্রচুর বই যাতে পাওয়া যায় গ্রহণ করুন সে উদ্যোগ। বই প্রকাশের দায়িত্ব ছেড়ে দিন প্রকৃত প্রকাশকদের হাতে। কিন্তু দাম নিয়ন্ত্রণের ভারটা রাখুন সরকারের হাতে। দয়া করে এসবের সঙ্গে মহামান্য এম.সি.এ-দের জড়াবেন না। তাঁদের অধিকাংশ কি ধাতুতে তৈরী তা এ ন'মাসে দেশবাসীর ভালো করেই জানা হয়ে গেছে। অবশ্য ব্যতিক্রম সর্বত্র রয়েছে, এখানেও আছে। সে 'ব্যতিক্রম'দের প্রতি আমাদের হাজারো সালাম।

নারী-স্বাধীনতা প্রসঙ্গে

নারী-স্বাধীনতা একটি পুরোনো কথা এবং বহুল আলোচিত। এর কোন ধ্রুব সুনির্দিষ্ট আর অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেই। সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে, সব সমস্যার মতো, এতেও রদবদল আর পরিবর্তন অনিবার্য। হাজার বছর আগে নারীর যে ভূমিকা ছিল, আজ আর তা নেই। তা হয়ে গেছে 'সেকেলে' অর্থাৎ পরিত্যাজ্য। কালের চাহিদা আর প্রয়োজনের সাথে সাথে এ না হয়ে উপায় নেই। বিশেষ করে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি আর অকল্পনীয় আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনে, ধ্যান-ধারণায় আর দৃষ্টি-ভংগিতে রূপান্তর ঘটেছে অবিশ্বাস্যরূপে। তবুও নারী আর পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এ বৈষম্যকে দু'শ্রেণীতে ফেলা যায়। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক, দ্বিতীয়তঃ অপ্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক বৈষম্য দূর করার সাধ্য নেই কারো। তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে আংশিক নিয়ন্ত্রণ করা যায় শুধু; যেমন সন্তান ধারণের বেলায়। মানব অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার যে গুরু দায়িত্ব তা মেয়েদের একক ও অদ্বিতীয় গৌরব। তাঁদের প্রতি প্রকৃতির এ এক অনন্য অবদান, প্রাকৃতিক বলেই একে এড়ানো যাবে না, যাবে না নির্মূল করাও। ব্যক্তিবিশেষ যদি তা করতে চায় করতে পারে কিন্তু তা হবে প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতা, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধতা। সার্বিক ভাবে এ বিরুদ্ধতা করা হলে মানব জাতির অস্তিত্বই পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। যা নারী-পুরুষ কারো কাম্য হতে পারে না। অতএব এখানে স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না।

অপ্রাকৃতিক যে বৈষম্য, নারীকে স্বাধীনতা খুঁজতে হবে সেখানে। অপ্রাকৃতিক বৈষম্য মানে মানুষের গড়া বৈষম্য, যা অর্থনৈতিক আর

সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত। এ বৈষম্য আদিতে ছিল না; তখন নারী ও পুরুষ সর্ব বিষয়ে সমান ছিল। এমন কি ইতিহাসের এক ধাপে মাতৃ-শাসিত তথা নারী শাসিত সমাজও ছিল। তখন নারীই ছিল সর্বেসর্বা, শাসন-পরিচালন আর হুকুমের মালিক। কালক্রমে, বহু উত্থান-পতন আর বিবর্তনের ফলে এ অবস্থা উল্টে গেছে। ফিরে এসেছে পিতৃ-পালিত তথা পুরুষ শাসিত সমাজ। এ সমাজে নারীর ভূমিকা হয়ে পড়েছে অপ্রধান, কিছুটা গৌণ। বাইরের বহু দায়িত্ব থেকে তাকে দেওয়া হয়েছে মুক্তি। এ মুক্তিই পরিণামে হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জীবনে বন্ধন। কারণ ঐ মুক্তির সাথে সাথেই সে হারিয়েছে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই সব মুক্তির বুনিয়াদ, সব রকম মুক্তির চাবিকাঠি। ঐ ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। এমন কি ঐ ছাড়া সামাজিক মর্যাদাও অর্জিত হতে পারে না। বাংলাদেশ যে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আজ তাও এ কারণে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না বলে এতদিন বাংলাদেশের মানুষ নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারে নি। ফলে তাকে নতুন করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে।

আমাদের দেশের মেয়েদেরও আজ সে অবস্থা। আগের তুলনায় তাদের জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বেড়েছে বই কি। তারা এখন বাইরে বেরুতে, দোকানপাটে যেতে, কেনাকাটা করতে পারে। কোন কোন পেশায়ও মেয়েরা এখন আগের তুলনায় বেশী করে অংশ নিচ্ছে। লেখাপড়ায় অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্য। সহ-শিক্ষায়ও এখন আর কোন আপত্তির কথা শোনা যায় না। ডাক্তারীতেও মেয়েদের সংখ্যা এখন আশাপ্রদ। শিক্ষিকার সংখ্যাও বহুগুণ বেড়েছে। এসবই শুভলক্ষণ। তবুও এ সত্যটা থেকে যায়—পুরোপুরি আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া মেয়েদের স্বাধীনতা কখনো পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। ঐ না হলে মেয়েদের যা দেওয়ার ও মেয়েদের কাছ থেকে সমাজের যা পাওয়ার তা দেওয়া এবং পাওয়া সম্ভব হবে না। তাই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই মেয়েদের স্বাধীনতাকে আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

মনীষী আবুল হুসেন স্মরণে

॥ এক ॥

১৫ই অক্টোবর। ৩৪ বছর আগে, ১৯৩৮ ইংরেজীর এ দিনটিতে অর্থাৎ ১৫ই অক্টোবর মনীষী আবুল হুসেন অকালে, তাঁর বহু স্বপ্নসাধকে অসমাপ্ত রেখে লোকান্তরিত হন। অকালে বলছি এ কারণে যে তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশও পূর্ণ হয়নি। কাজেই শিক্ষা-জীবনের সমাপ্তির পর, নিজের মনীষা আর কর্মদক্ষতার পরিচয় দেওয়ার জন্য তিনি হাতে পেয়েছিলেন অতি অল্প সময় মাত্র। তবুও এ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার। তাঁর কর্মজীবনের শুরু অধ্যাপনায় আর শেষ আইনজীবী হিসেবে। দেশে প্রচলিত যে আইন আর আইনের শাসন রয়েছে এবং জনগণের জীবনে, বিশেষ করে মুসলিম আইনের ধারা-উপধারা সামাজিক জীবনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে তাঁর মতো অন্য কেউ এতখানি ভাবনা-চিন্তা করেছেন বলে আমার জানা নেই। এ আইনকে কি করে যুগোপযোগী রূপ দিয়ে গতিশীল আর জীবনের জন্য অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা যায় এ নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বৃটিশ-ভারতে মুসলমান আইন' আর 'ওয়াকফ বিল' স্মরণ করা যেতে পারে। প্রথমোক্ত প্রবন্ধের সূচনায় আবুল হুসেন সাহেব বলেছেন : 'গোড়াতেই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বৃটিশ-রাজ ভারতীয় মুসলমানের মাত্র ওয়ারিসী স্বত্ব, দান, বিবাহ, তালাক, ওয়াকফ ও হকশোফা (রাইট অফ প্রি-এম্পশন) সম্পর্কিত আইনের প্রচলনে সম্মতি দিয়েছেন, কিন্তু অপরাপর আইনের প্রচলন বন্ধ করেছেন। তারপর ঐ সমস্ত প্রচলিত আইন পরিচালনার জন্য মুসলমান-আইন-সঙ্গত যে বিধি-বিধান প্রচলিত ছিল, যেমন ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ, তাও বন্ধ করেছেন।

তাতেও পক্ষান্তরে বৃটিশ অনুমোদিত মুসলমান-আইনের ব্যবহার (প্র্যাকটিশ) অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাতে মুসলমান সমাজে মুসলমান আইনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও ভয় অনেকখানি কমে গেছে এবং সে জন্যই মুসলমান সমাজের শ্রী ফুটতে পারছে না। আর একদিক থেকে ভারতীয় মুসলমানের জীবন বিকশিত হতে পারছে না। আরবী না জানার দরুন অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমান আইনের প্রকৃত মর্ম বিচারকগণ উপলব্ধি করতে না পেরে ভুল অর্থে আইনের প্রয়োগ করায় মুসলমান সমাজের বর্তমান অবস্থার সাথে মুসলমান-আইনের সামঞ্জস্য হারিয়ে গেছে ও প্রতিনিয়ত যাচ্ছে।' (আবুল হুসেনের রচনাবলী: প্রথম খণ্ড, পৃঃ - ১২৪)

বাংলাদেশে বিপুল ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। এসম্পত্তিগুলি যাতে সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালিত আর যে মহৎ ও লোকহিতকর উদ্দেশ্যে এ ওয়াকফগুলি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য যাতে সাধিত হয় সে লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি ওয়াকফ আইনের সংস্কার চেয়েছিলেন এবং অশেষ শ্রমে তৈরী করে দিয়েছিলেন ওয়াকফ বিল। আমার বিশ্বাস, আমাদের ওয়াকফ সম্পত্তি-গুলি আজো তাঁর রচিত সে বিল অনুসারেই পরিচালিত হচ্ছে।

॥ দুই ॥

'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' আজো এক অবিস্মরণীয় নাম। এ দেশের নব্য মুসলিম সমাজে এ প্রতিষ্ঠানটি একদিন এক প্রবল ভাবান্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। যার প্রয়োজন আজো নিঃশেষিত নয়—ফল্গু ধারার মতো আজো তার রেশ বয়ে চলেছে অনেকের মনে। সেদিনের স্মৃতিতে আমার মতো আজো অনেকে হয়ে ওঠে শিহরিত। এ সমাজেরই মূলমন্ত্র ছিল: "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" এরই ফলশ্রুতি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রধান-পুরুষ ছিলেন মনীষী আবুল হুসেন। সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁরই ভূমিকা ছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এ প্রতিষ্ঠানের ধরতে গেলে তিনিই ছিলেন প্রাণপুরুষ। যতদিন সাক্ষাৎভাবে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক,

প্রধান পৃষ্ঠপোষক, প্রধান সারথি এবং প্রধান সংগঠক। সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখার'ও তিনি ছিলেন আসল সম্পাদক—এমনকি সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম যখন ছাপা হতো না তখনো সম্পাদনার যাবতীয় দায়িত্ব তিনিই পালন করতেন। আমরা ছিলাম স্রেফ সাক্ষীগোপাল। 'শিখা' আর সাহিত্য সমাজের খরচের সিংহভাগও তিনিই বহন করতেন।

তিনি কতখানি আদর্শবাদী আর সমাজ-প্রেমিক ছিলেন তাঁর নিম্নউদ্ধৃত মন্তব্য থেকেই তা উপলব্ধি করা যাবে: "একদিন আমার কোন বন্ধু বলছিলেন, 'মুসলমান সমাজের বর্তমান অবস্থা দেখে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি।' তার উত্তরে আমি বলেছিলুম, 'ঠিক ঐ জন্যই আমি মুসলমান বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করি না। মুসলমানের বর্তমান ইতিহাস নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করি না। আমি তার বর্তমান দুর্গতির জন্য আমার সৌভাগ্যবোধ করি; কারণ এই দুঃস্থ সমাজে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে নানা প্রকারে সেবা করবার প্রচুর সুযোগ লাভ করতে পারব। জগতের মহাপুরুষগণ চিরদিনই দুঃস্থ অধঃপতিত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের জীবনস্মৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক।"

এ ছিল আবুল হুসেনের জীবনদর্শন আর দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গির তাড়নায় তিনি 'সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্পাদনা করেছিলেন 'শিখা' আর 'তরুণপত্র' নামে এক স্বল্পায়ু মাসিকও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে স্বাধীন চিন্তার বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'আল-মামুন ক্লাব', উচ্চবেতনের নিরাপদ অধ্যাপকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দুরূহ ও অনিশ্চিত ব্যবহার-জীবীর জীবন তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ঐ জীবনে স্বাধীনতা বেশী, নিজের মেধা আর শক্তির পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রও প্রশস্ত। তদুপরি দেশ আর সমাজের বৃহত্তর পরিধিতে নিজের সেবাকে সম্প্রসারণের

সুযোগ ঐ পেশায় তিনি আরো বেশী পাবেন—এ ছিল তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস। তাঁর সব কর্ম-এষণা আর স্বপ্ন-কল্পনার পেছনে সমাজ সেবার তাড়নাই ছিল প্রচণ্ড আর প্রবলতম।

॥ তিন ॥

তাঁকে আমি মনীষী বলে অভিহিত করেছি। আমাদের সমাজে সত্যিকার মনীষীর সংখ্যা অতি নগণ্য। সে নগণ্য-সংখ্যকদের মধ্যে আবুল হুসেন একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী রাখেন। তাঁর চিন্তা আর মনস্বিতার পরিধি দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। সম্প্রতি কবি আব্দুল কাদিরের সম্পাদনায় 'আবুল হুসেন রচনাবলীর' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এর বিষয়-সূচী দেখলেই তাঁর মননশীলতার ব্যাপ্তি আর গভীরতার খানিকটা আঁচ করা যাবে। সম্পাদক বিষয় অনুসারে আবুল হুসেনের রচনাবলীকে ন' ভাগে চিহ্নিত করেছেন। যেমন, (১) সমাজ। এভাগে ১০টি রচনা স্থান পেয়েছে। (২) সংস্কৃতি। এ ভাগে স্থান পেয়েছে ৫টি রচনা। (৩) আইন। এখানে স্থান পেয়েছে ২টি লেখা। (৪) শিক্ষা। এ ভাগে তিনটি। (৫) রাজনীতি। এখানে ২টি। (৬) অর্থনীতি। এ ভাগে ৫টি। (৭) জীবনচর্চা। এ ভাগে ৫টি। (৮) সাহিত্য। এ ভাগে ৮টি আর (৯) ছোটগল্প। এ ভাগে স্থান পেয়েছে ৬টি রচনা।

চিন্তা আর মননের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবুল হুসেনের মন অবাধে বিচরণ করেছে। তাঁর আরো বহু রচনা প্রকাশের প্রতীক্ষায়। অনেক রচনা এর মধ্যে কালের গর্ভে হয়তো হারিয়েও গেছে। স্বল্পায়ু জীবনে, স্বল্পকালের ব্যবধানে এ যে অসংখ্য রচনা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি—এর কোনটাই চর্বিত-চর্বণ নয়। সর্বত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য আর নিজস্ব চিন্তার স্বাক্ষর রয়েছে। ভিন্নধর্মী এত বিষয়ে, চিন্তা আর ভাবের এতখানি আলো আর কেউ বিকিরণ করেছেন কিনা জানি না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এ চিন্তা-বীরের চিন্তা আর সাধনার সঙ্গে আমাদের এ যুগের তরুণদের

তেমন পরিচয় আছে বলে মনে হয় না। পরিচয় লাভের তেমন আগ্রহও কোথাও দেখা যায় না। মনে হয় সাহিত্য আর সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের যে উচ্ছাস তা অনেকখানি মেকি। ইতিহাসের বহু ধাপ পেরিয়ে যেমন একটা জাতি জাতি হয়ে ওঠে, স্বাশ্রয়ী হয়, তেমনি চিন্তা আর মননশীলতার বহু বাঁক আর মোড় ঘুরে আর পেরিয়ে জাতির চিন্তা আর সংস্কৃতির রূপরেখা নির্মিত হয়। বাংলাদেশেও ইতিহাসের বহু ধাপ পেরিয়ে আজ খাঁটি অর্থে বাংলাদেশে রূপান্তরিত। উত্তরণের এ বিচিত্র পথে শুধু কর্মী আর রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটেনি। বহু ভাবুক আর চিন্তাবিদেরও আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের বিশ্বাস-ভাবনার ফসলও আমাদের পরম সম্পদ। ইতিহাসের ধারাকে অস্বীকার করা যায় না, যায় না মুছে ফেলা। আমাদের পূর্বসূরীরা সে ইতিহাসেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতির মানস-ভাণ্ডারে তাঁরা যে আয়ুধ করে রেখে গেছেন আমাদের মানস-গঠনে আর সংস্কৃতি নির্মাণে তার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে আবুল হুসেনের মতো চিন্তাবিদের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত না হওয়া মানে আমাদের মানসিক বিবর্তনের ইতিহাসকে জানতে না চাওয়া! এতে ইতিহাসের কিছু এসে যায় না, ক্ষতি হয় নিজেদের। এভাবে জাতি হয়ে পড়ে আত্মবিস্মৃত।

॥ চার ॥

আবুল হুসেন যশোর জেলার পানিসারা গ্রামে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী মোহাম্মদ মুসা, মায়ের নাম আছিরুন নেছা খাতুন। পানিসারা আবুল হুসেনের মাতামহের দেশ। তাঁর পিত্রালয় যশোর জেলায় ঝিকরগাছা থানায় কাউরিয়া গ্রাম। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যশোর জেলা স্কুল থেকে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। আই. এ., বি. এ. পাস করেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে—যথাক্রমে ১৫ টাকা আর ২৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে। কাজেই ছাত্র হিসেবে তিনি যে খুব মেধাবী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম. এ. পাস করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯২১ হতে ১৯২৭ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি আর আর বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ঐসময়—অধ্যাপনাকালেই

তিনি বি. এল. ও পাস করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি ছেড়ে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুকাল ঢাকায় আইন-ব্যবসা করার পর (১৯৩২ ইংরেজীতে) তিনি কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে আইনের ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৩১-এ তিনি বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম এম. এল অর্থাৎ 'মাষ্টার অব ল' ডিগ্রী লাভ করেন। বাঙালী মুসলমান হিসাবে এ, ডিগ্রি আজো তাঁর একক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সর্ব্বোচ্চ সম্মান 'ঠাকুর ল' লেক্চারার' পদের জন্যও তিনি তৈয়ারি হচ্ছিলেন। এর সুদীর্ঘ সিস্থসিসও তৈয়ার করে ফেলেছিলেন তিনি। হঠাৎ এ সময় দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ রোগ থেকে তিনি আর আরোগ্য লাভ করেননি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তাঁর কলকাতার বাসায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এভাবে একটি অসাধারণ প্রতিভার অকাল সমাপ্তি ঘটে। [তাঁর জীবনের তথ্যগুলি কবি আবদুল কাদির লিখিত ভূমিকা থেকে গৃহীত।]

———

শান্তির পথ ও পাথেয়

মানুষ আজ এক দো-টানার শিকার। বস্তু আর অ-বস্তুর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সে আজ ক্ষত-বিক্ষত। উন্নত-অনুন্নত সব দেশেরই আজ এ অবস্থা। কোথাও শান্তি নেই, নেই নিরাপত্তা কিম্বা মানসিক স্বস্তি। একদিকে বিজ্ঞানের অসম্ভব অগ্রগতি অন্যদিকে বিরোধ আর সংঘর্ষের দ্রুত বৃদ্ধি। এ এক অবিশ্বাস্য রকমের স্ববিরোধ। কারণ উন্নতি—সে বিজ্ঞানের কিম্বা সাহিত্য-সংস্কৃতির অথবা অর্থনৈতিক যে ক্ষেত্রেই হোক, তা যদি শান্তি ও নিরাপত্তার সহায়ক না হয় তা হলে তা কখনো উন্নতি পদবাচ্য নয়। শান্তি যেমন অবিভাজ্য, তেমনি উন্নতিও অবিভাজ্য—তাও সার্বিক ও সর্বব্যাপক স্বাস্থ্য মানে যেমন সারা দেহের স্বাস্থ্য, শুধু হাত কিম্বা পায়ের স্বাস্থ্য নয় তেমনি শান্তি আর নিরাপত্তাও সর্বদেশের আর সর্ব মানবের হতে হবে। এ হওয়ার প্রাথমিক শর্ত পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এ করা না হলে পৃথিবী থেকে দ্বন্দ্ব আর বিরোধের অবসান ঘটবে না। কারণ পুঁজিবাদ বৈষম্যেরই জারজ সন্তান বিরোধেই তার বৃদ্ধি, বিকাশ আর সম্প্রসারণ। ইতিহাসের জন্মলগ্ন থেকে পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংগ্রাম ঘটেছে তার মূলে পুঁজিবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট বৈষম্য। জীবন, জীবনের প্রয়োজন আর সমস্যা অত্যন্ত রূঢ় বাস্তব—এখানে বৈষম্য জিইয়ে রেখে 'শান্তির ললিত বাণী' শোনালে মানুষের জীবনে শান্তি কখনো নেমে আসবে না। কাজেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বৈষম্যের মূল উৎপাটন করতে হবে সর্বাগ্রে এবং তা করার পথ আর পদ্ধতির নাম সমাজতন্ত্র।

কোন মানুষের পক্ষেই আজ আর বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কোন দেশ বা জাতির পক্ষেও আজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকা। সংঘর্ষ আর বিরোধ যেখানেই ঘটুক না কেন তার প্রতিক্রিয়া থেকে আজ কোন দেশেরই নিস্তার নেই। য়ুরোপের যুদ্ধ বাধলে আমাদের জীবনের তটে এসেও তা আঘাত হানে, এমনকি দেখা দেয় আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাজারেও উত্থানপতন। তেমনি আমাদের দেশের সংঘর্ষের ঢেউ গিয়ে পৌঁছে ঐ দেশের হাটে বাজারেও। এ প্রায় অবারিত ও অপ্রতি

রোধ্য। এ ভাবেই ক্ষেত্র তৈরী হয় বিশ্বযুদ্ধের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও মূল কারণ বৈষম্য আর বঞ্চনা। মানুষকে বলা হয় 'অর্থনৈতিক জীবন'—কারণ সব মানুষকেই সর্বাগ্রে খেয়ে-পরে বাঁচতে হয়। বেঁচে থাকার পরই আসে সভ্যতা-সংস্কৃতি আর ধর্মকর্মের প্রশ্ন—ইহকালের প্রয়োজন মিটলেই পরকালের চিন্তা বা দুশ্চিন্তা। গৃহ-সুখের পরেই স্বর্গসুখ।

এ বৈষম্য শুধু এক দেশ কিম্বা কয়েকটি দেশ থেকে দূর হলেই চলবে না। সারা বিশ্ব থেকেই দূর করতে হবে। এ করার জন্য যে সমাজতন্ত্র, তাই তার রূপ হতে হবে বৈশ্বিক। প্রাথমিক চেতনার জন্য জাতীয়তার প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু জাতীয়তা দেশগত বলে তা বিরোধ আর বৈষম্য দূরীকরণের ব্যর্থ প্রমাণিত। বরং উগ্র জাতীয়তা বহু বিরোধ আর সংঘর্ষের কারণ হয়ে থাকে। একারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর Nationailsm হইতে জাতীয়তাবাদকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন।

সমাজতন্ত্র পদ্ধতি আর দৃষ্টিভংগিতে বৈশ্বিক আর সর্বমানবিক বলে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার একমাত্র সমাজতন্ত্রই হতে পারে। ধর্মের বৈষম্য কত যে যুদ্ধ আর রক্তপাতের কারণ হয়েছে তা কারো অজানা নয়। জাতীয়তাবাদের ইতিহাসও রক্ত-রঞ্জিত। যেহেতু সমাজতন্ত্র মানব-ভ্রাতৃত্বে, মানুষের ঐক্য আর জীবনের প্রয়োজনের সম-অধিকারে বিশ্বাসী তাই পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে নির্বাসিত করে, শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ, আমার বিশ্বাস একমাত্র-সমাজতন্ত্রই রচনা করিতে পারে।

সমাজতন্ত্র আর বিশ্ব শান্তি হাত ধরাধরি করে চলে। কারণ এ দুই পরস্পরের পরিপূরক। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাই সব সমাজতান্ত্রিক দেশ একই সাথে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। আমরাও আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তা করতে হলে আমাদেরও শান্তির সংগ্রামে শরিক হতে হবে। এ সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার বিশ্ব-শান্তি পরিষদ। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এ পরিষদই সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিল আমাদের সমর্থনে এবং আমাদের অনুকূলে গড়ে তুলেছিল বিশ্বজনমত। আমাদের স্বাধীনতার শত্রুর অভাব নেই, বিশ্বের বৃহত্তম পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক চীনও আমাদের বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছে। আজ এ অবস্থায় আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে নির্বিঘ্ন করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দেশে নবগঠিত শান্তি কমিটিগুলিকে আরো জোরদার আর মজবুত করে গড়ে তোলা। দলমত নির্বিশেষে সব শান্তিকামী নাগরিকেরাই এ বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

মুনির চৌধুরী

"একদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত এক তরুণ ডাক্তার এসে বল্লেন : মুনীর ভাই টাকা এক শ' (সংখ্যাটা দেড় শ'ও হতে পারে, এখন ভুলে গেছি) আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছেন যে-কোন প্রকারে আপনার জন্য কেবিন যোগাড় করতে, এ টাকায় না কুলোয় আমার নিজের থেকে দিতে বলেছেন। কেবিন ত একটাও খালি পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তারটি মুনিরের খালাত ভাই বা এ ধরনের কোন আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। কথাটা শুনে কিছুটা অবাক হলাম—এঁদের সঙ্গে আমার কোন রকম আত্মীয়তা নেই, নেই তেমন কোন ঘনিষ্টতাও। তবুও আমার বিপদে এঁরা আজ লোভের বস্তুকেও লোভনীয় মনে করছে না। ক্ষণিকের জন্য হলেও মুহূর্তে ভুলে গেলাম দেহের সব দুঃখ-যন্ত্রণা।"

আমার আত্মজীবনী 'রেখাচিত্রে' এ কথাগুলি লিখেছিলাম অনেককাল আগে। মুনির চৌধুরী তখন বেঁচে ছিলেন। আমার বিশেষ আনন্দ এ বই তিনি পড়েছিলেন। ১৯৬২ ইংরেজীতে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলাম চিকিৎসার জন্য। সাধারণ ওয়ার্ডে বহুতর রোগীর অনবরত আর্তস্বরের মধ্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল তাই বন্ধুরা আমার জন্য একটা কেবিন যোগাড়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। আমার প্রতি পরম প্রসন্নশীল মুনির চৌধুরী এসে চেষ্টায় হয়েছিলেন শরীক। উদ্ধৃত কথাগুলিতে সে ইঙ্গিতটুকুই আপনারা দেখতে পাবেন।

মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় চট্টগ্রামে ১৯৪৭ ইংরেজীতে। তখনো মুনীর ছাত্র—সেবারই বোধকরি ও এম. এ. শেষ পরীক্ষা দেবে ইংরেজীতে। বলা বাহুল্য মুনীর বাংলায় এম. এ. পাশ করেছেন অনেক পরে ১৯৫৩-র যখন জেলে ছিলেন, ভাষা আন্দোলনের সে নির্যাতনের সময়। সে নির্যাতনের বিরুদ্ধে এর চেয়ে মোক্ষম প্রতিবাদ আর কি হতে পারে! অবশ্য জেলে বসেই তিনি আরো একটি অন্যতম

আর কালজয়ী প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন—সেটি তাঁর অমর নাটিকা 'কবর'। মুনীর চৌধুরী আজ নেই কিন্তু মাতৃভাষার শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর এ 'প্রতিবাদ অমর হয়ে রইল আমাদের ভাষায়।

১৯৪৭-এর গোড়ায় পাকিস্তান হবে হবে অবস্থা যখন তখন একদিন মুনীর চৌধুরী, শওকত ওসমান আর গোলাম কুদ্দুস—এ তিন তরুণ এক সঙ্গে চাটগাঁ এসে হাজির। জানতাম তিনজনই প্রগতির পতাকাবাহী। ছাত্রমুনীরের হ্যাংলা লিকলিকে চেহারা। শওকত ওসমান পাশ করে সবে মাত্র চাকুরী পেয়েছেন কলকাতার কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে আর লিখে চলেছেন দুই হাতে। গোলাম কুদ্দুস তখন সঠিক কি করতো মনে নেই তবে কবিতা লিখতো। সংগ্রামী কবিতা—এ জানতাম। প্রাণবন্ত আর সাহিত্য শিল্পে উৎসাহী তরুণদের পেলে তখন আমি প্রায় যেমন হাতে আসমান পেয়ে যেতাম। আমি তখন চাটগাঁ কলেজে অধ্যাপক আর থাকি ছোট্ট একটা কাঁচা ঘরে—ঐ ঘরে তিনজনকে ডেকে এনে মাটিতে মাদুর পেতে বেশ আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করলাম একদিন। কী আনন্দেই না ছিল সে দিনগুলি—এ তিন তরুণ তখন আবেগ-উচ্ছ্বাসে ফাটো ফাটো। প্রাণের উজ্জ্বল্যে যেন এক একটি দীপশিখা।

সেদিনই এদের নিয়ে স্থানীয় জে. এম. সেন হলে এক সভাও করলাম। তিনজনেই বক্তৃতা করলেন—সে বক্তৃতায় উৎসাহ-উদ্দিপনা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সংকল্পই ছিল প্রধান কথা। মনে পড়ে মুনীর চৌধুরী বক্তৃতা দিয়েছিলেন নাটক সম্বন্ধে—বলা বাহুল্য এটি তার প্রিয় বিষয়। পরবর্তী জীবনেও নাটক ছিল তাঁর সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। সেদিন, লেখক-জীবনের সে সূচনাকালে মুনীর ঘোষণা করেছিলেন—তিনি নাকি লিখবেন—নাটকের মাধ্যমে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাত হেনে সমাজকে শোধরাবেন। মনে পড়ে এমন একটি আশা আর সংকল্প যেন মুনীর সেদিন প্রকাশ করেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে। পরবর্তী জীবনে তিনি একাধিক সফল একাঙ্কিকা লিখেছেন। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নামে একটি নাটকও করেছেন প্রকাশ—অনুবাদ নাটকে তিনি পরিচয় দিয়েছেন সবিশেষ দক্ষতার। মনে হয় নাটকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রাজা বার্নাড শ' ছিলেন মুনীরের প্রিয়—তাই শ'র নাটক তিনি অনুবাদ করেছেন, রঙ্গমঞ্চে

যা পেয়েছে স্বীকৃতি। অধ্যাপক হিসেবে গবেষণা আর সমালোচনার প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম ছিল না। এ-সব বিষয়েও তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'মীর মানস' আর 'তুলনামূলক সমালোচনা' আমাদের সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজনা। বাংলা টাইপরাইটার নির্মাণেও তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শুনেছি শিক্ষক হিসেবে মুনীর চৌধুরীর তুলনা মুনীর চৌধুরীই। অমন শিক্ষক নাকি দুর্লভ। তাঁর অধ্যাপনা এত আকর্ষণীয় ছিল যে, অন্য ক্লাশের এমন কি অন্য বিষয়ের ছাত্ররাও এসে তাঁর ক্লাসে ভিড় জমাতো।

আমেরিকা থেকে উচ্চতর অধ্যয়ন শেষ করে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসার পর একদিন আমার বাসায় এসেছিলেন মুনির দেখা করতে। অনেক আলোচনার পর হঠাৎ বলে উঠলেন: আপনার অনুমতি হলে আমি একটা সিগারেট খাই।

অবাক হলাম। আমেরিকা ফেরৎ, অসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন এ স্বনামখ্যাত অধ্যাপকটি বলে কি! সাক্ষাৎ-ছাত্ররাই এখন অবলীলাক্রমে আমাদের সামনে সিগারেট ফুঁকে ফুঁকে সারাঘর ধূম্রাচ্ছন্ন করে তোলে—আর মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী অধ্যাপক আর বিভাগীয় অধ্যক্ষ কিনা সিগারেট খাওয়ার জন্য অনুমতি চাইছে আমার। জানি বিনয় আর সৌজন্য মহৎ চরিত্রের লক্ষণ—মুনীর চরিত্রে সে লক্ষণ আমি বহুবার দেখেছি। মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আবাসিক গৃহে থাকতেন তার মুখোমুখী বাসায় থাকে আমার মেয়ে-জামাই। ১৯৭০-এর গোড়ায় অথবা ৬৯-এর শেষের দিকে আমি একবার কয়েকদিনের জন্য ওখানে ছিলাম। ওদের বারান্দা থেকে মুনীরের পড়ার ঘর দেখা যায়। প্রায় দিন দেখতাম বেশ রাত থাকতে উঠে মুনীর নিবিষ্ট মনে পড়া-শোনা করছে।

মেয়ে-জামাইর মুখেও শুনলাম মুনীর নাকি ঐভাবেই পড়াশোনা করে সব সময়। বুঝতে পারলাম ভালো অধ্যাপক হওয়ার জন্য মুনীর এভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেন। ঐ তাঁর অভ্যাস আমার মনে হয়। অধ্যাপক হিসাবে মুনীরের অসাধারণ সুনামের কারণ এখানেই নিহিত। অধ্যাপনায় ফাঁকি দিতেন না, জানতেন না ফাঁকি দিতে। নিজে ভালো

যাঁরা ছিলেন বলে কি করে ভালো হয় তৈয়ারী করতে হয় সে কৌশল তাঁর জানা ছিল। একদিকে ভাষার উপর যেমন ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার তেমনি তিনি ছিলেন অতুলনীয় বাক-কৌশলী। ঐ গুণ ছিল তাঁর সহজাত। ঐ গুণে তিনি ছাত্রদের যেমন তেমনি সভাসমিতি কি আলোচনা-সভায় শ্রোতাদের মন্ত্র মুগ্ধ করে রাখতেন। অমন উচ্চারণের বাক-কৌশলী বক্তা কি আলাপচারী আমাদের মধ্যে খুব কমই আছেন। আমি তাঁর দ্বিতীয় জুড়ি দেখছি না।

যেবারের কথা বলছি সেবারই তাঁর উপরের তলায় এক বন্ধু গৃহে চা খেয়ে নামবার সময় তাঁর খোঁজ করেছিলাম। তিনি তখন বাসায় ছিলেন না। বাজার থেকে ফিরে এসে তিনি যখন শুনলেন আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম, তক্ষুনি তিনি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন আমার খোঁজে। শেষকালে বেগম সুফিয়া কামালের ধানমণ্ডি বাসায় এসে আমাকে পাকড়াও করেন। এবারও সঙ্গে শওকত ওসমান ছিলেন। ওখানে বসে বসে অনেক বেলা পর্যন্ত আমরা দেশ-দুনিয়ার নানা বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করলাম, সুফিয়া কামালের অনেক চা-নাস্তা ধ্বংস করে আমরা যখন উঠলাম তখন বেলা পশ্চিম দিকে হেলতে শুরু করছে। মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে ঐ আমার শেষ দেখা।

তাঁর নিহত হওয়ার খবর যখন শুনলাম তখন আমাদের মনের অবস্থা যা হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। সে থেকে মনে বারে বারে এ প্রশ্নই হানা দেয়, মুনীর চৌধুরীকে হারিয়ে আমাদের শিক্ষা আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা কি কখনো পূর্ণ হবে? কেউ কি কারো স্থান পূর্ণ করতে পারে?

কবিকে শান্তিতে থাকতে দিন

: আপনি ঢাকা যান নি?

: না। কেন বলুন ত?

: নজরুল এসেছেন, যিনি আপনাদের বন্ধু, গুরু, সহযাত্রী ও শ্রদ্ধার পাত্র, যার স্নেহে আপনারা ধন্য ও কৃতার্থ। মনে করেছিলাম তাঁকে দেখতে আপনি ঢাকা চলে গেছেন।

: না। যাইনি, বিনে পয়সায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েও যাইনি। যাওয়ার আগ্রহ কি তাগিদ বোধ করিনি এতটুকু।

: সত্যি?

: কেন! হাঁ আমাদের চির পরিচিত, চির প্রিয় আর মন-মানসের চিরসাথী নজরুলের ইমেজ আছে আমাদের মনে, যার প্রদীপ্ত রূপ আজো আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয় আর অবিনশ্বর। কখনো মুছবার কি হারিয়ে যাওয়ার নয়। আবেগ উচ্ছ্বাস আর যৌবন-দীপ্ত যে সূর্যের আলো-উত্তাপ আমাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে তাকে আমি কোন কিছুরই বিনিময়ে হারাতে চাই না। আমাদের যৌবনের আর আমাদের সাহিত্য জীবনের সে এক পরম ধন। এখন গিয়ে মুমূর্ষ, স্থবির, অথর্ব, নির্বাক, আবেগ-অনুভূতিহীন, নিবদ্ধ নিষ্প্রভ চোখে চেয়ে থাকা এক ছায়া মূর্তিকে দেখে আমি কি আবার সে পরম ধন আর অমূল্য সম্পদকে অক্ষুণ্ন, অবিবর্ণ, অবিপর্যস্ত রাখতে পারবো? সে নির্মম দৃশ্য কি করে সহ্য করবো। আমরা, নজরুলের এক কালের প্রিয়পাত্ররা? তাই আমি ঢাকা যেতে পারিনি। যে ঢাকায় একদিন নজরুল আমার মতো শত শত তরুণকে যৌবনমুখর করে তুলেছিল। যে ঢাকায় বইয়ে দিয়েছিল একদিন নজরুল গান আর গজলের ঢেউ, বইয়ে দিয়েছিল পৌরুষ-প্রদীপ্ত কণ্ঠে কবিতার পর কবিতা আবৃত্তির ঝড়। আজ সে ঢাকায় নজরুল এসেছেন। না, নজরুল নয়। এসেছে নজরুলের প্রেত-মূর্তি, এসেছে রুগ্ন, পঙ্গু, বাক-শক্তিহীন এক অসহায়

বয়স্ক শিশু। এ দৃশ্য কি করে আমরা সহ্য করি। না এ নজরুলকে আমি দেখতে যেতে পারবো না। পারবো না আমার মনের পটে যে ইমেজ আঁকা রয়েছে তাকে স্বহস্তে ভেঙে চুরমার করে দিতে। নজরুল আমাদের ভক্তি-ভালোবাসার পাত্র—কখনো ছিলেননা দর্শনীয় এক্সি-বিট। আমরা তাঁকে তা করতে পারবো না। আজ যাঁরা স্রেফ প্রচার-প্রচারণার উদ্দেশ্যে তা করেছেন তাঁদের প্রতি মনে মনে আমাদের একটি বিনীত ধিক্কার রয়েছে।

একদিন ঢাকাতেই খান বাহাদুর, রায়বাহাদুরেরা নজরুলের সঙ্গে মোলাকাত করতে চেয়েছিল। শুনে প্রদীপ্ত নজরুল বজ্র-কণ্ঠে বলে উঠেছিল কি! আমি দেখা করবো রায় বাহাদুর, খান বাহাদুরের সঙ্গে! আমি দেশের কবি, রায়বাহাদুর, খান বাহাদুরেরা পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে থেকে কুর্ণিশ করবে আমি দু'হাতে সে কুর্ণিশ গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে যাবো। তাঁদের সঙ্গে এত আমার সম্পর্ক। এবার নজরুল আসেন নি, তাঁকে আনা হয়েছে। আনা হয়েছে মুমূর্ষ, মূক, স্পন্দনহীন, অক্ষম এক নজরুলকে। এখন তাঁর পাশে ভিড় জমিয়েছেন আগের দিনে যাঁরা খান বাহাদুর, রায়বাহাদুর হতেন তাঁদের উত্তরসূরীরা। যাঁরা জন্ম দিবস ছাড়া নজরুলের নাম নেন না, গরু খোঁজা করেও যাঁদের বাড়ীতে নজরুলের একটি কি দু'টি বইও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর নজরুল জন্মদিবসে তাঁরাই ত এ-বাড়ী ও-বাড়ী নজরুলের বইয়ের তল্লাশী লাগান।

সব ভালো জিনিস, মূল্যবান বস্তু, জীবনে কাজে লাগে। কিন্তু কবির কাছে? নজরুলের তো কবির কাছে এর কানাকড়ি মূল্যও নেই। বেঁচে থাকলে অর্থাৎ সুস্থ থাকলে আপনারা কাছেও ঘেঁষতে পারতেন না—দূর থেকে, সভার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এ প্রদীপ্ত কবি সূর্যকে দেখে আপনাদের নয়ন মন সার্থক করতে হতো। আজ কবি একটি শিশু, একটি পুতুল। আজ আপনারা এ পুতুলকে নিয়ে খেলা করছেন। ইচ্ছা মতো সাজাচ্ছেন, খেয়াল খুশী মতো নাড়াচ্ছেন। মূল্যবান এক্সিবিটের মতো একবার এখানে একবার ওখানে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছেন লোকজনকে আর্থিক লাভ না হোক, ভালো

প্রচারণা যে এত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। যুগটাই প্রচারণার যুগ কি না! তাই আপনাদের দোষ দেব না। নজরুলের প্রতি আপনাদের প্রগাঢ় ভক্তির জন্য, নজরুলের প্রাক্তন ভক্তদের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে মনে হয়, কাগজের বর্ণনা পড়েও এ ধারণাই হয়েছে আমার আপনাদের ভক্তির আতিশয্যে কবির খুবই কষ্ট হচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি—এ অবস্থায় তাঁর যা অত্যন্ত প্রয়োজন। আজ তিনি এক শিশু—শিশুকে কোল থেকে কোলান্তরে টানা হ্যাঁচড়া করলে শিশু শান্তি পায় না। এমন কি মায়ের এক স্তন থেকে অন্য স্তনে নিয়ে যাওয়ার সময়ও শিশু কেঁদে ওঠে। আমাদের কবি-শিশুর তেমন করে কাঁদবার শক্তিটুকুও নেই। দর্শনার্থীদের কে রাম কে রহিম তা জানার বোধশক্তিটুকু হারিয়ে গেছে তাঁর। এ অবস্থায় কবির হাতে ফুল আর গলায় মালা পরিয়ে দেওয়ার পোজে ছবি নাইবা তুল্লেন, সত্যই ভিড়ে কবির কষ্ট হয়। আজ তার সবচেয়ে প্রয়োজন শান্তি আর নির্জনতা।

অতএব সবিনয় নিবেদন ঃ কবিকে শান্তিতে থাকতে দিন।



শান্তির পথ-সন্ধানী

এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে কার্য-কারণ ছাড়া কিছুই ঘটেনা—তুচ্ছাতিতুচ্ছ থেকে বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা, অভ্যুত্থান, বিপ্লব, নূতন ভাবাদর্শ নিয়ে মহামানবের আবির্ভাব ইত্যাদি প্রত্যেক কিছুই কার্যকরণ সূত্রে আবদ্ধ। বৌদ্ধ দর্শনের পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'—তার মূল কথা বোধ হয় এটি।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, তার সাধনা ও বাণীর কি কোন ঐতিহাসিক পটভূমি নেই? বলা বাহুল্য বিশ্ব-বিধানে ইন্দ্রজালের কোন স্থান নেই। কিছুই স্বয়ম্ভু নয়। মহাপুরুষেরা হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েন না। তাঁদের আবির্ভাব ঘটে ইতিহাসের দাবীতে, যুগের চাহিদায় ও প্রয়োজনে।

তৃষিত যুগ-চিত্তে তাঁরা আনেন অমৃতবারি। সব মহাপুরুষদের বেলায়ই একথা সত্য। তবে স্মরণীয়, তাঁরা যুগ-চেতনার প্রতিনিধি বটে, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠে থাকে যুগাতীত বাণী, হাতে থাকে চিরন্তন মনুষ্যত্বের শাশ্বত দীপশিখা।

বুদ্ধদেবেরও আবির্ভাব ঘটে এই উপমহাদেশের এক চরম সংকটের দিনে। যখন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বোধ অধঃপতনের প্রায় শেষ ধাপে। ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের নামে মানুষ যখন জীবহত্যায় উন্মত্ত। মানুষ শুধু নয়, মানুষকল্পিত দেবতাও যখন দেবত্ব ছেড়ে হয়ে উঠেছে রক্ত-পিপাসু। যুগাবতার সাক্ষাৎ প্রতীক বুদ্ধদেবের মুখে তখনই ধ্বনিত হল—'অহিংসা পরম ধর্মঃ'। মুহূর্তে ইতিহাসের গতিধারা যেন বদলে গেল। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমন বীর্যবন্ত প্রতিবাদ ইতিপূর্বে আর শোনা যায়নি। মনুষ্যত্বের দিকে, আত্মার দিকে ফিরে তাকাল বিভ্রান্ত মানুষ। মানুষের হ'ল নবজন্ম—হল আত্মার নতুন করে উদ্বোধন। রাজসিংহাসনের তুঙ্গশীর্ষ থেকে, পারিবারিক ও সাংসারিক সুখ-সম্পদের আরাম-শয্যায় বসে এই প্রতিবাদ করলে তা লোকের কানে পৌঁছলেও হৃদয়ে কখনও পৌঁছত না। কিন্তু সর্বত্যাগী এই রাজভিক্ষু

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বছর অবর্ণনীয় কঠোর সাধনার দ্বারা এই মনুষ্যত্ব-ধর্ম যথা জীবনসত্য আবিষ্কার করেছিলেন। আত্মোপলব্ধ সত্যের এই অগ্নিবীণা ব্যর্থ হওয়ার নয়। নয় তা দেশকালের সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমিত হয়ে থাকার, এই সত্যের উত্তরাধিকার সব মানুষের সব দেশের ও সব যুগের। বুদ্ধদেব শুধু মৌলিক বা মামুলি প্রেমের বুলি, মৈত্রীর কথা বা অহিংসার বাণী আওড়াননি। নিজের জীবনে তা তিনি পালন করেছেন, শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন ব্যবহারিক জীবনে তা পালন করতে। কঠোর ব্রতধারী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের দৈনন্দিন জীবন হয়েছে এই নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আজকের দিনেও আমরা শান্তির কথা, মৈত্রীর কথা চারদিকে যার তার মুখে এবং যখন তখন শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এই শান্তি হচ্ছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের মৌখিক বুলি, এর সঙ্গে হৃদয়ের নেই কোন সম্পর্ক, নেই মনুষ্যত্বের যোগাযোগ। এসব নিছক ব্যক্তিগত, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ হাসিলের এক রকম ফন্দিফিকির মাত্র। ব্যক্তি তথা মানুষকে বাদ দিয়ে কাগজে-পত্রে শান্তির জন্য গর্জন করলে ভালো প্রপোগেণ্ডা হতে পারে বটে কিন্তু তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না কিছুতেই। তাই আমাদের জীবদ্দশায় আমরা দু-দু'টা নরমেধ-যজ্ঞ দেখতে পেলাম। আজও পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষ করে সামরিক শক্তিমত্ত দেশগুলি অহরহ মুখে শান্তির বাণী আওড়াচ্ছে আর হাতে-কলমে তৈরী করছে বিচিত্র ও বিপুল ধ্বংসকর আণবিক বোমা। দেশে দেশে চালাচ্ছে নৃশংস হত্যা-যজ্ঞ। হাতে এদের আণবিক বোমা, মুখে শান্তির ললিত বাণী। কপটতা ও আত্মপ্রবঞ্চণার এমন লজ্জাকর রূপ, ইতিহাসে বোধ হয় দ্বিতীয়বার দেখা যায়নি।

ব্যক্তি বা মানুষই হল সমাজ ও রাষ্ট্রের এক একটি অঙ্গ। সেই মানুষ যদি সৎ না হয়, সেই মানুষের মন থেকে যদি অবিদ্যা দূরীভূত না হয়, সেই মানুষ যদি 'মধ্যমা প্রতিপৎ' গ্রহণ না করে, মোট কথা ব্যক্তি-মানুষের মন থেকে যদি হিংসা-বিদ্বেষ নির্মূল না হয়, তা হলে শান্তি চিরকাল মানুষের নাগালের বাইরে বন্যহংস হয়েই থেকে যাবে। মনের ভিতর ছুরি শান দিতে দিতে মুখে শান্তির বাণী আওড়ালে কে

শান্তি নেমে আসবে তা হচ্ছে কবরের শান্তি। তা কখনো জীবনের শান্তি নয়। জীবনের শান্তির পথ মানুষ খুঁজে পাবে মহামানব বুদ্ধের জীবন মহিমায়। তাঁর শিক্ষা, বাণী ও নির্দেশে। আজকের জিঘাংসা উন্মত্ত মানুষের কানে কি সেই শান্তির বাণী প্রবেশ করবে? সেই দুরূহ সাধনার পর—সর্বগ্রাসী হিংসা-বিদ্বেষ, উগ্রতা ও অন্ধতা পরিহার করে অহিংসার সাধনা, 'মধ্যমা প্রতিপদের' মহিমা তথা প্রজ্ঞার মহিমা মানুষ কি গ্রহণ করবে? যদি করত তাহলে আর একটা মহাযুদ্ধের আতঙ্কে আজ পৃথিবীতে নাভিশ্বাস উঠত না। তা হলে মানুষ স্বস্তিবোধ করতে পারত। ঘরে ঘরে নেমে আসত শান্তি। বুদ্ধদেবের সার্থক চরিতকার অশ্বঘোষ বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন, "তৃষিত জীবলোক ঐ উত্তমা ধর্মনদীর জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। প্রজ্ঞাস্রোতে এ নদী বেগবতী। স্থির বিণয়-ব্যবহারই এ নদীর তটকে দৃঢ় ও সমাধি এর জলকে করেছে নির্মল। আর এই উত্তমা নদীর জলে ব্রতচারী চক্রবাকেরা ক্রীড়া করেছে।" এইভাবে কাব্যের এক অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভাষার বৌদ্ধধর্মের মর্মোদঘাটন করেছেন ভাষাশিল্পী অশ্বঘোষ। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের 'ধর্মপদে' বুদ্ধ বলেছেন,—"বৈরিগণের মধ্যে আমরা বৈরীহীণ হয়ে সুখে জীবন-যাপন করব, বিদ্বেষভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বেষশূন্য হয়ে বিচরণ করব। আতুরগণের মধ্যে ক্লেশরহিত হয়ে সুখে জীবন-যাপন করব ও বিচরণ করব।" ইত্যাদি (ডাঃ প্রবোধ বাগচীর অনুবাদ)।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের এযুগ মহাপুরুষের যুগ নয়। এটি নয় মহৎ কথা বা মনুষ্যত্ব-মহিমার যুগ। এ যুগ হচ্ছে স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রবিদ্‌দের যুগ। ফাঁকা বুলির যুগ। তাই মনে হচ্ছে আমাদের দিনে পৃথিবীব্যাপী যে বুদ্ধ-বন্দনা চলছে তাও অনেকখানি ফাঁকা—লোক দেখানো ব্যাপার। তবুও মনে হয় এও একেবারে মূল্যহীন নয়। সত্যিকার মহাপুরুষদের নিছক লোক-লজ্জার খাতিরে স্মরণ করলেও তা একেবারে ব্যর্থ যায় না। এই ফলে কারো না কারো মনে মহাবুদ্ধের সাধনালব্ধ প্রজ্ঞাপারমিতার স্পর্শ ঘটতে পারে। তা হলে বুদ্ধ না হউন তিনি যে জীবনের মহাসত্যে প্রবুদ্ধ হবেন তাতে সন্দেহ নেই। আজ বুদ্ধের পঞ্চশীল যদি রাজনৈতিকবুলি না হয়ে জীবনের বাণী হয়ে উঠে তা হলে নিঃসন্দেহে আমরা ঘরে ও বাইরে, দেশে ও বিদেশে সর্বত্র শান্তির মুখ দেখতে পাব। শান্তির পথ সুগম হোক।

বেতার শিল্পীদের পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে

বেতারে, টেলিভিশনে এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য যখন কারো ডাক পড়ে, তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই তাঁর বিশেষ কোন গুণ রয়েছে। কোন একটা বিষয়ে তিনি যে পারদর্শী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। না হয় খাস করে তার ডাক পরবে কেন? এ বিশেষ গুণটির জন্যই তিনি হয়তো লেখক, গায়ক, অভিনেতা, নাট্যকার কিম্বা বাদক হিসেবে চিহ্নিত। এ গুণটি তিনি আয়ত্ত করেছেন বহু শ্রমে আর দীর্ঘদিনের সাধনায়। বলাবাহুল্য এ বিশেষ গুণটির জন্যই তিনি অন্যদের চেয়ে কিঞ্চিৎ আলাদা ও স্বতন্ত্র। বেতার-টেলিভিশন আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর আদর-কদর একমাত্র এ কারণেই। ব্যাপক অর্থে এঁরা শিল্পী নামে পরিচিত। এঁদের ছাড়া বেতার-টেলিভিশন চলে না—চলে না কোন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। এঁরা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। এ সব শিল্পীদের অনেকেই জীবনভর স্ব-স্ব শিল্পকর্মে আত্মনিবেদিত। এতেই কেটে যায় সারাটি জীবন। তবে এ কথাও সত্য জীবন কেটে যায় বটে, কিন্তু জীবিকা নির্বাহ এতে হয় না। তাই বেঁচে থাকার জন্য শিল্পীদেরও কোন না কোন চাকুরী বা ব্যবসা গ্রহণ করতে হয়। শিল্প সাধনার বাইরে তাকেও খুঁজতে হয় জীবিকার বিকল্প পথ।

আমাদের দেশে আজো জীবিকার দুটো মোটা সড়ক হচ্ছে—সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী। এ দুয়ের আর্থিক মূল্যমান প্রায় সমান। কোন কোন বেসরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বরং বেতনের হার বেশী। যেমন বড় বড় শিল্প কারখানা আর স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায়। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখা গেছে কোন কোন বেসরকারী স্কুল কলেজে মাইনের হার সরকারী স্কুল-কলেজ থেকে বেশী। এসব নির্ভর করে বেসরকারী স্কুল-কলেজের আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাইনে আর আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সরকারী কলেজ শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশী।

এ রকম আরো বহু বেসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার কর্মচারীরা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের তুলনায় বেশী মাইনে শুধু নয় গাড়ী বাড়ীর সুবিধাও পেয়ে থাকেন অনেক বেশী। সে যাইহোক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিঘোষিত বাংলাদেশে সরকারী এবং বেসরকারী সকল পর্যায়ের কর্মচারীর মান মর্যাদা অন্ততঃ সরকারী পর্যায়ে সমান হওয়া উচিত। অথচ সরকার বিঘোষিত সাম্প্রতিক বেতার ও টেলিভিশনের শিল্পীদের পারিশ্রমিকের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বজায় রাখা হয়েছে। বেতার ও টেলিভিশনের শিল্পীকে দুই জাতে ভাগ করার কারণ কি? সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিল্পী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিল্পীদের মধ্যে কোন অকারণে টেনে আনা হয়েছে এ রকম একটা বিরাট পার্থক্য? এটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। শিল্পীর পরিচয় তিনি শিল্পী। সেখানে আবার সরকারী বেসরকারী ভাগ কেন? কেন, তাঁদের নিয়ে এমন অশোভন ও পক্ষপাতমূলক শ্রেণী বিভাগ?

গুণগত মূল্যায়ণ হয়ত সমর্থন করা যায়। একজন প্রতিষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর গায়ককে যে পারিশ্রমিক দেয়া উচিত, একজন শিক্ষানবিশ নতুন গায়ক বা নিম্নমানের গায়ককে সে অনুপাতে কম পারিশ্রমিক দেয়া হলে তা অসঙ্গত হয় না। কিন্তু যেখানে গুণগত কোনরকম কম-বেশীর বিচার না করেই সরকারী ও বেসরকারী বেতার টেলিভিশন শিল্পীর পরিচয় চিত্রিত করা হয়েছে, আমাদের আপত্তিটা সেখানেই। বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক বা কর্মচারী যেখানে একটি রচনা ও পাঠ করে প্রতি মিনিটের জন্য পারিশ্রমিক পাবেন দশ টাকা হারে সত্তর থেকে একশত টাকা, সেখানে একজন সরকারী কলেজ স্কুল শিক্ষক বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী পাবেন খুব বেশী হলে সর্বমোট মাত্র ত্রিশ টাকা। একজন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তিন হাজারী প্রশাসক বেতার ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম করে যা পারিশ্রমিক পাবেন, একজন সরকারী স্কুলের বা প্রতিষ্ঠানের দুশো টাকা বেতনের শিক্ষক অথবা কর্মচারী পাবেন মাত্র পঁচিশ টাকা অর্থাৎ বেসর-কারী শিল্পীর চার ভাগের এক ভাগ। সরকারী কর্মচারী যতো উঁচুমানের

সাধক শিল্পীই হোন না কেন, তার পারিশ্রমিকের হারের অগ্রগতি হওয়ার কোন সুযোগ নেই। একজন বেসরকারী কর্মচারী শিল্পীর বাৎসরিক পারিশ্রমিকের কোন সীমারেখা নেই। পাঁচ ছয় হাজার টাকা হতেও আপত্তি নেই। কিন্তু সরকারী কর্মচারী শিল্পী সম্বৎসরে পাঁচশো টাকার বেশী বেতার টেলিভিশন থেকে পারিশ্রমিক পাবেন না।

সরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন নাট্যকার বেতারে নাটক লিখে পারিশ্রমিক পাবেন চল্লিশ টাকা এবং তার মান যত উন্নতই হোক না কেন। অথচ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন নাট্যকার বেতারে নাটক লিখে পেতে পারেন তিনশো টাকা! এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। অন্য দেশে এমন ব্যবস্থা আছে বলে আমরা জানা নেই। তা থাকলেও এ ব্যবস্থা কোন ন্যায়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সমর্থনলাভ করবে বলে আমরা বিশ্বাস হয় না। অবিলম্বে এ দৃষ্টিকটু, শ্রুতিকটু ও সবরকম ন্যায়ধর্মের পরিপন্থী এ অদ্ভুত ব্যবস্থার অবসান ঘটুক, সরকারের কাছে এ আমাদের দাবি। এ পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন কলাকৌশলের মান যে দ্রুত নেমে যাচ্ছে, এ বোধ করি অনেকে লক্ষ্য করেছেন। সরকারী স্কুল-কলেজ আর অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন (ভবিষ্যতেও বহু শিল্পী সরকারী চাকরি করবেন) তাঁদের জন্য পারিশ্রমিকের এ দুস্তর ব্যবধান আর পক্ষপাতমূলক এ ব্যবস্থার জন্য তাঁদের অনেকে বেতার টেলিভিশনে অংশগ্রহণে তেমন উৎসাহবোধ করেন না, অনেকে স্রেফ অস্বীকার করে বসেন। এ কারণে বেতার টেলিভিশনে অনেক সময় ভাল কথক আর উন্নতমানের রচনা পাওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষ তাই চেষ্টা করেও প্রোগ্রামের মান উন্নত করতে ব্যর্থ হন। এ ব্যর্থতার অভিযোগ আমি বহুবার শুনেছি।

সরকারী আর বেসরকারী চাকরিজীবী শিল্পীদের পারিশ্রমিক তথা ফিসের মান সমান করা হলে তাতে খরচের যে খুব একটা তারতম্য হবে তা আমার মনে হয় না। কারণ সরকারী চাকরিজীবী শিল্পীর সংখ্যা খুবই সীমিত। এ করা হলে আমার বিশ্বাস সরকারী ও বেসরকারী চাকুরে শিল্পীদের মন থেকে অযথা আরোপিত শ্রেণীভেদ দূর হবে। সে সঙ্গে দূর হবে অসন্তোষ ও অসহযোগিতার মনোভাব।

বেতারে, টেলিভিশনে তখন সৃষ্টি হবে একটা সুস্থ পরিবেশ যা অনুষ্ঠানের মানোন্নয়নে করবে প্রভূত সহায়তা।

ইতিপূর্বে অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশ ছিল ঔপনিবেশিকবাদের শিকার ক্ষেত্র। তখন সংস্কৃতিসেবীদের দাবিয়ে রাখা এবং সবরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা একটা নীতিই ছিল। ঐ সরকারের সে নীতি স্বাধীন বাংলাদেশেও অনুসৃত হওয়ার কোন মানে হয় না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যেখানে সরকারী নীতি সেখানে শিল্পীতে শিল্পীতে শ্রেণীভেদ তথা অসাম্য সৃষ্টির সবরকম আইনকানুন অবিলম্বে বর্জন করা উচিত।

তবে যেসব শিল্পী নিজ নিজ শিল্পসাধনায় সর্বতোভাবে আত্মনিমগ্ন অর্থাৎ যাঁরা সর্বক্ষণের শিল্পী, অন্য কোন পেশা বা ব্যবসায়ে যাঁরা লিপ্ত নন, নিজের শিল্প ছাড়া জীবিকার অন্য কোন পন্থা নেই, তেমন শিল্পীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এসব আত্মনিবেদিত শিল্পীদের বাঁচার দাবি স্বীকার করে নিয়ে তাদের জন্য উপযুক্ত মানানসই ফিস বা পারিশ্রমিক ধার্য হোক এ আমরা চাই। যেসব শিল্পীর জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে তাঁদের তুলনায় একমাত্র শিল্প-সাধনায়ই যাঁদের জীবিকার অবলম্বন তাঁদের ফিস স্বভাবতই বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ প্রসঙ্গে বেতার সংস্থায় নিয়োজিত বা চাকরিরত কোন শিল্পী সম্পর্কেও সরকারের উদার হওয়া প্রয়োজন। বেতার-চাকুরে শিল্পীকে শিল্পসাধনায় উৎসাহিত করার জন্য শিল্পী হিসেবে তাঁকেও যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেয়া উচিত।

দেশের সকল নাগরিক মাত্রই শিল্পী নয়। শিল্পীর শিল্পগুণ তার অতিরিক্ত সম্পদ—সেখানে সরকারী ও বেসরকারী শ্রেণীকরণ করা ভুল।

আশা করি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আর বিভাগীয় কর্মকর্তারা এ বিষয়ে সচেতন ও সচেষ্ট হবেন এবং অগোণে এ ব্যাপারে একটা ন্যায় আর যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, যাতে শিল্পীতে শিল্পীতে শ্রেণীভেদ থাকবে না। দেশের শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যেসব বিষয়ে নিবিড় সম্পর্ক সে সব বিষয়ে যথাসম্ভব অপক্ষপাত ও উদার মনোভাব গ্রহণ করাই উচিত। এসব বিষয়ে সব সময় চুলচেরা হিসেব করা যায় না বলে একটা সুষম মর্যাদায় মানদণ্ড নির্ধারিত হলে সব দিক দিয়েই সুবিধা।

গণতন্ত্র ও পরমতসহিষ্ণুতা

সম্প্রতি ভারতের মুসলিম লীগ নেতার পরলোকগমন ঘটেছে। হজ করে ফেরার পথেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জেদ্দায়। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—কংগ্রেসশাসিত ভারত সরকারও তাই। মুসলিম লীগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও নামে এবং আদর্শে নিঃসন্দেহে তা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই চিহ্নিত। ভারতে আজো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বেআইনী ঘোষিত হয়নি। হয়তো কোন দিন হবেও না। হয়তো প্রয়োজনও পড়বে না তা করার। ঐ ধরনের কিছু করা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বরখেলাপ। ভারত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই গড়ে উঠেছে —ওখানকার ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসেরও লক্ষ্য সর্বাগ্রে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা। তাই বহু অবাঞ্ছিত দলকেও তারা সয়ে গেছে, গায়ের কি আইনের জোরে দিতে চায়নি বন্ধ করে। বিরুদ্ধ দলের প্রতি সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য শর্ত। ভারত সে শর্ত পালন করছে, মনে হয় চেষ্টা চলছে পুরোপুরি অনুসরণ করে চলার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একাধিক দলের অস্তিত্ব যেমন অনিবার্য তেমনি অনিবার্য আদর্শগত সংঘর্ষও। ভারতেও তার অভাব নেই—তবে ওদেশের সরকার আর প্রতিষ্ঠানগুলো সে সংঘর্ষ আর বিরুদ্ধতার মোকাবেলা করে থাকে গণতান্ত্রিক পথে—গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। অন্ততঃ সংসদীয় রাজনীতি বা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলো এ করে থাকে। কংগ্রেস ঐ রকম একটি দল আর স্বাধীনতার গোড়া থেকেই কংগ্রেস ওখানে রয়েছে ক্ষমতায়। তবুও তাদের বিরুদ্ধে ছোট-বড় কোন দলকেই তারা নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি। গ্রহণ করেনি তেমন কোন উদ্যোগ। এর ফলেই ভারতে মুসলিম লীগও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে এবং সে নামে আজো নিয়ে থাকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশও। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার বেলায় তাঁরা নির্ভয়ে পালন করে থাকে নিজেদের ভূমিকা; যদিও দেশের সামগ্রিক পরিবেশ মোটেও এর অনুকূল নয়। নিজেদের বিশ্বাস আর মতাদর্শের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠায়

এ এক নিঃসন্দেহ প্রমাণ একথা দু'পক্ষের প্রতি সমানে প্রযোজ্য। সুখের বিষয়, ভারতে নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার লোকেরও অভাব নেই। তাই দেখতে পাচ্ছি, ওদেশের মুসলিম লীগ নেতার মৃত্যুতে দেশের রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি ও জননেতা শোক প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। এঁদের অনেকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্নতর রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীও।

মুসলিম লীগ নেতা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেও অন্য সম্প্রদায়ের গুণীজনের কাছে শ্রদ্ধেয় হতে পেরেছেন এ তাঁর পক্ষে সত্যই গৌরবের কথা। তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু সার্বজনীন গুণ ছিল যা সম্প্রদায় আর মতাদর্শ নির্বিশেষে বহু মানুষের শ্রদ্ধা আর প্রশংসার দাবি রাখে। অন্য ধর্ম ও মতাদর্শের যেসব মানুষ তাঁর প্রশংসায় এগিয়ে এসেছেন, স্বদলীয় লোকেরা কি বলবে না বলবে তার কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে তাঁরাও কম প্রশংসনীয় নন। দল, সম্প্রদায় আর গোষ্ঠী-সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারা নিঃসন্দেহে মহৎ চরিত্রের লক্ষণ। মুসলিম লীগ নেতার মৃত্যুতে আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করে ভারতের একাধিক মুসলিম লীগ-বিরোধী নেতা এ মহৎ চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের পক্ষে এটি গৌরবের কথা এবং আমাদের সামনে এ মনোভাব এক মহান দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো। এমন দৃষ্টান্তের অনুসারী হতে হলে হৃদয়কে প্রশস্ত আর মনকে উদার করতে হয়। ভিন্ন দলের মানুষ ছোট বা হেয় নয়। এমনকি সাম্প্রদায়িক দলের সব মানুষও ক্ষুদ্র বা অবজ্ঞার পাত্র নয়। এ বিশ্বাস ও চেতনা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আমরা, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মনে হয়, মনমানসের এ স্বাস্থ্যটা দিন দিনই হারিয়ে ফেলছি। আমরা দিনে দিনে বড্ড সংকীর্ণ আর অত্যন্ত অনুদার হয়ে পড়ছি, নিজের দল ছাড়া অন্যদলের প্রতি হয়ে পড়ছি অসহিষ্ণু। পরমত-অসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের পয়লা নম্বরের শত্রু। এ শত্রু আজ আমাদের সংবৃহৎ রাজনৈতিক দলের আঙিনায় বাসা বেঁধেছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য শুভ লক্ষণ নয়। এ দেশে (ভারত-বাংলাদেশ দু'দেশেই) বহু ধর্ম বা ভাষা সম্প্রদায়ের বাস—প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজস্ব কিছু অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া

থাকে। অতীতেও ছিল, এখনো আছে। অতীতে এ অভাব-অভিযোগ আর দাবি-দাওয়ার বহর আর তীব্রতা ছিল অনেক বেশী, দেশে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তিও এ কারণেই। কালের অবস্থায় আর ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তনের সাথে সাথে সাম্প্রদায়িকতা তথা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সীমারেখাও অনেকখানি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। কালক্রমে রাষ্ট্র আর সমাজ-মন যখন পুরোপুরি গণতন্ত্রের পথ ধরে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে, তখন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজনই থাকবে না। এরি মধ্যে ভারত-বাংলাদেশে বহু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু ঘটেছে। আমার বিশ্বাস, ঐসব আর কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনই সব কিছুর জন্ম দিয়ে থাকে। সমাজতন্ত্রে সে প্রয়োজনই ফুরিয়ে যাবে। তখন আইন করে বে-আইনী ঘোষণার প্রয়োজন পড়বে না।

সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির স্বীকৃতি এক কথা, জনজীবনের সর্বত্র তার বিস্তৃতি, সম্প্রসারণ, বাস্তবায়ন ভিন্ন কথা। দীর্ঘদিনের সংস্কার মন থেকে অত সহজে নির্মূল হয় না। মন-মেজাজে আর প্রাত্যহিক আচার-আচরণে গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠা সাধনাসাপেক্ষ। ভারত-বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংবিধান চালু হয়েছে, চালু রয়েছে সত্য কিন্তু সর্বব্যাপারে মানুষ কি তার সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে? পারেনি বলেই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ভারতে, বাংলাদেশে আজো রয়ে গেছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে সত্য; কিন্তু সমাজজীবনে সম্প্রদায়বিভাগ, শ্রেণীবিভাগ আগের মতই রয়ে গেছে। ভারতেও সেই একই অবস্থা।

যতদিন আমরা আমাদের লক্ষ্যে অর্থাৎ গণতন্ত্রের পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে না পারছি, ততদিন ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আমাদের সয়ে যেতে হবে। সয়ে না গেলে—ওসব 'গোপনীয়তার' পথ ধরবে এবং তা হবে সমাজ আর রাষ্ট্র উভয়ের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। সয়ে নিয়ে ঐ সবের ক্ষেত্র বা প্রয়োজন দূর করা হলেই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু অনিবার্য। মনে হয় ভারত সে পথেরই অনুসরণ করে চলেছে। আমার বিনীত নিবেদন—ভিন্নধর্মী বা ভিন্ন মতাবলম্বী দল বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অসহিষ্ণু

হওয়া উচিত নয়—উচিত নয় ঐসব দলের নেতা-উপনেতাকে হেয় ও দেশের শত্রু মনে করা। এখন বিরোধী দলকে শত্রু, ঐসব দলের নেতা-উপনেতাদের 'বিদেশের চর' ইত্যাদি বলে যেভাবে বেপরোয়া নিন্দা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে দেশে তাতেই আমি শঙ্কিত। এমনধারা প্রবণতা প্রশ্রয় পেলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ব্যাহত না হয়ে পারে না। তখন সমাজতন্ত্র হয়ে পড়বে দুর্নিরিক্ষ। ফলে ধীরে ধীরে দেশ ফ্যাসীবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়বে। ফ্যাসীবাদ কিন্তু বুমারেঙ হতে দেরি লাগে না। এ অবস্থা দেখেই ভারতের মহৎ দৃষ্টান্তের কথা আমার মনে পড়লো।

———

বুদ্ধদেব বসু ও মোহিত প্রসঙ্গে

আমার পক্ষে বুদ্ধদেব বসু সম্বন্ধে পরিপূর্ণ, এমনকি চলনসই আলোচনাও সম্ভব নয়। তাঁর রচনার অজস্রতা আর আমাদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্যতা তার অন্যতম কারণ। তাঁর অনেক গ্রন্থের নামও জানা নেই আমার, দেখা কি পড়া দূরে থাক। এত সীমিত পরিচয় নিয়ে বুদ্ধদেবের মতো সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে বিচরণশীল লেখকের প্রতি সুবিচার আশা করা যায় না।

এ যুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁকে প্রায় সব্যসাচীই বলা যায়, তাঁর দক্ষতা আর কৃতিত্ব গদ্যে-পদ্যে সমান। তাঁর সহজ গতিশীল প্রাণবন্ত খাঁটি বাংলা গদ্যের আমি ভক্ত বল্লেও চলে। সুধীন্দ্রনাথ আর বিষ্ণুদের বন্ধু আর অধ্যবসায়ী পাঠক হয়েও তিনি তাঁদের গদ্য থেকে শত হস্তে দূরে থেকেছেন সবসময়। শৈল্পিক মনোহারিত্ব আর সাহিত্যিক আমেজ এতটুকু না হারিয়েও বাংলা গদ্যের সহজবোধ্য সরলরূপ যে কত অনায়াসে সবরকম সাহিত্যের বাহন আর আঙ্গিক হতে পারে তার নজির বুদ্ধদেব বসুর গদ্য। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ: কথা সাহিত্য', 'কবি রবীন্দ্রনাথ' সাদামাটা বাংলা গদ্যের এক চরম শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন। এ অদ্ভুত মনোহারী গদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর 'উত্তর তিরিশ' আর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে'। আমার বিশ্বাস প্রতি সাহিত্য-নবিশেরই এ বইগুলো পড়া উচিত। বাংলা গদ্যের আটপৌরে শ্রী অথচ ভদ্র ও শালীন প্রকাশশৈলীর একটা আদর্শ তাঁরা এতে দেখতে পাবেন নিঃসন্দেহে। বুদ্ধদেবের কৃতিত্বে আমাদের কিছু অতিরিক্ত খুশির কারণও রয়েছে। বর্তমানে এবং দীর্ঘকাল ধরে কলকাতাবাসী হলেও, আদতে বাংলাদেশের, সাবেক পূর্ববাংলারই মানুষ তিনি। তাঁর শৈশব কেটেছে নোয়াখালীতে, কৈশোর-যৌবনের এক বড় অংশ ঢাকায়। তিনি বড় হয়েছেন ঢাকার আবহাওয়া আর পরিবেশে। তাঁর মন-মানস আর প্রকৃতি গড়ে উঠেছে ঢাকার পুরানো পল্টন, রমনা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের

আওতায়। এ সব স্মৃতি তাঁর মনের উপর এত বেশী ছাপ ফেলেছে যে, তিনি তা কখনো ভুলতে পারেননি, তাঁর বিভিন্ন রচনায় এ স্মৃতি বার বার ফিরে ফিরে ছায়াপাত শুধু নয় কায়াপাত ঘটিয়েছে। পূর্ববঙ্গীয় জেদ, অন্য কথায় যাকে এক-গুঁয়েমিও বলা যায়, তা নিয়ে তাঁর মনে আজো যেন কিছুটা গর্ববোধ রয়েছে। একবার কোথায় যেন লিখছিলেনও 'নানা ক্ষতি স্বীকার করেও 'কবিতা' পত্রিকাটি যে এত বছর চালাতে পেরেছি সে শুধু আমার পূর্ববঙ্গীয় জেদের জন্যই।" ভাষাটা হুবহু তাঁর নাও হতে পারে। তবে ভাবটা এই। সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর রমনার অমন নিখুঁত চমৎকার চিত্র, তিনি ছাড়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন প্রাক্তন ছাত্র এঁকেছেন বলে আমার জানা নেই। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ যাবৎ কম লেখক বের হয়নি; কিন্তু অমন করে আর কেউই সে যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকে অতখানি জীবন্ত করে তুলতে পারেননি বা তোলেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব আমাদের সামান্য জুনিয়র ছিলেন—খুব সম্ভব মাত্র এক বছরের। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি ঢাকা ইসলামিক ইণ্টার থেকে আর বুদ্ধদেবরা আসেন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে—যে ইণ্টারমিডিয়েটে কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন বাংলার অধ্যাপক তখন। পরে এটিই পরিণত হয়েছে ঢাকা কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সম-সাময়িক হলেও পরস্পর আলাপ-পরিচয় ছিল না আমাদের। বড় কারণ পরিচিত হওয়ার মতো কোন সম্বলই ছিল না আমার পেছেনে তখন পর্যন্ত। অন্যদিকে বুদ্ধদেব তখনই নামজাদা। 'কল্লোলে' তাঁর লেখা ছাপা হচ্ছে, নিজেদের পুরানা পল্টনের আস্তানা থেকে বের করেছেন 'প্রগতি' নামক মাসিক। অতি আধুনিক সাহিত্য নিয়ে যে হৈ-হল্লোড় তার অন্যতম নায়ক তিনি। সে সঙ্গে ছাত্রখ্যাতি ত রয়েছেই। সে ছাত্রাবস্থায় জগন্নাথ হলে একবার অভিনীত হয় তাঁর এক একাঙ্কিকা—মনে পড়ে ঐ একাঙ্কিকার তীব্র তীক্ষ্ণ তির্যক সংলাপ ছিল, যেন এক একটি শর নিক্ষেপ। ছাত্র-অধ্যাপকে টই-টম্বুর হতে হল করতালিতে মুখর—যবনিকা পড়তেই প্রভোজষ্ট ডক্টর রমেশ মজুমদার দেখতে প্রায়-বালক লেখককে হাত ধরে টানতে টানতে স্টেজের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে কোনরকমে দুই লাজুক হাত জোড় করে একটুখানি

ভুলেই অন্তর্ধান করলেন সেদিনকার বিনম্র কুন্ঠে নাট্যকার। তাঁর তখনকার অসহায় সলজ্জ অবস্থা আমি এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-কমন-রুম, করিডোর, লাইব্রেরী ইত্যাদির যে মনোরম ছবি তিনি এঁকেছেন (বলা বাহুল্য সেদিনকার বিশ্ববিদ্যালয় মানে বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) সেখানে আমি তাঁকে বহুবার দেখেছি। সবসময় অজিত দত্ত থাকতেন সঙ্গে। কবি অজিত দত্ত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'কুসুমের মাস' আর যাঁকে বুদ্ধদেব উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা'। সে-যুগের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। এ যুগল মূর্তি ছাড়া বুদ্ধদেবকে কখনো নিঃসঙ্গ দেখেছি মনে পড়ে না। অজিত দত্ত ছাড়া মাঝে-মধ্যে আরো কেউ কেউ যে সঙ্গে না থাকতেন তা নয়, তবে তাঁরা আমার কাছে অজানা। অনবরত সিগারেট ফুঁকতেন, ঐ বিদ্যায় প্রায় বালক বয়স থেকেই যেন বুদ্ধদেব ছিলেন ওস্তাদ। অজিত দত্ত ফর্সা, বুদ্ধদেব থেকে লম্বা, দেখতে বেজায় সুদর্শন। সুকোমল চেহারা বলতে যা বুঝায় অজিত দত্তের চেহারা ছিল অবিকল তাই। বুদ্ধদেব বাঁটি-খাট্টো ছোট্ট মানুষটি, মাথাভর্তি তৈলস্পর্শহীন চুল, ধুতির কোঁচা ভূলুণ্ঠিত আর হাতে সবসময় জলন্ত সিগারেট। এ ছবিখানা এখনো মনে আছে। আবার ছাত্র হিসেবে ডাকসাইটে! এম. এ. শেষ পরীক্ষায়ও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, ইংরেজীতে। সম্ভবতঃ তিনিই একমাত্র লেখক, ভালো পাসের ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও ভালো চাকরির স্বপ্ন না দেখে, সাহিত্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন—সে যুগে যখন লেখার কোন দাম দেয়া হতো না। এদেশে এ এক অকল্পনীয় আর দুঃসাহসিক ঝুঁকি; বোধ করি এও আর একরকম পূর্ববঙ্গীয় জেদ বা একগুঁয়েমি। পরে অবশ্য এখানে ওখানে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন না কোন চাকরি নিতে তিনিও যে আরো অনেকের মতো বাধ্য হননি তা নয়, তবে ঐ যে কথায় বলে মানুষ অবস্থার দাস, তাই পূর্ব সংকল্পে সবসময় অটল থাকা তাঁর মতো পরিশ্রমী প্রতিভার পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

আজ যে হঠাৎ তাঁর সম্বন্ধে এত কথা মনে পড়ছে আমার, তার কারণ সম্প্রতি তাঁর একটি গল্প-সংকলন হাতে এসেছে, যার নাম "ভাসো

আমার ছেলা"। তাঁর বিভিন্ন সময়ের ত্রিশটি গল্পের এক বৃহৎ সংকলন। এর কোন কোন গল্প যে আমি আগে অন্যত্র পড়িনি তা নয়। তবুও বেশ কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটলো এ গল্পগুলির সাহচর্যে। এ আনন্দই তাঁর সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিচারণের প্রেরণা যুগিয়েছে আমার মনে। এ সংকলনের 'আবছায়া' আর 'সবিতা দেবী'। গল্প দুটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর রমনার ছবি আঁকা হয়েছে অত্যন্ত উপভোগ্য আর হার্দ্য ভাষায়। 'তুলসীগন্ধ' গল্পেও ঢাকার ছবি রয়েছে। যে বয়সে দেহ-মনের সব দরজা-জানালা, শিরা-উপশিরা উন্মুখ হয়ে ওঠে সবকিছু গ্রহণের জন্য, প্রেম-ভালোবাসার জন্য, 'নতুন কিছু করোরে ভাই, নতুন কিছু করো'—এ চেতনায় উদ্বেল হয়ে উঠে মন-মানস আর সর্বসত্তা, বুদ্ধদেবের সে বয়স কেটেছে ঢাকায় আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐ বয়স আর ঐ বয়সের অভিজ্ঞতা কিছুতেই মুছে যাওয়ার কি মুছে ফেলার নয়। আমরা বুদ্ধদেবের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের সে যুগের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনকে তিনি খানিকটা হলেও ভাষায়িত করে রেখেছেন। 'প্রেম' নামক গল্পটি এ গ্রন্থে স্থান পায়নি, ঐ গল্পেও বিশ্ববিদ্যালয় আর লেখকের কৈশোরিক জীবন ভারী চমৎকার ভাবে আঁকা হয়েছে। এমনি হয় তো আরো অনেক লেখায়। মোহিতলাল মজুমদারকে যাঁরা জানতেন, ঢাকায় যাঁরা তাঁকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন বা দেখেছেন, তাঁদের চিনতে বাকি থাকবে না যে, 'সবিতা দেবী' নামক গল্পের ললিত চন্দ্রই স্বয়ং মোহিতলাল! গল্পের যেভাবে পরিণতি টানা হয়েছে তার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নেই, তবে ললিতচন্দ্র মানুষটি যে নির্ভেজাল মোহিতলাল এ বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। ক্লাসিক-মনা মোহিতলালের যেমন অতি-আধুনিকদের প্রতি একটা জাত-ক্রোধ ছিল তেমনি অতি-আধুনিকরাও তাঁকে দেখতেন বিষনজরে। এখন যাঁদের ত্রিশের লেখক নামে চিহ্নিত করা হয় সে যুগে তাঁরাই চিহ্নিত হতেন অতি-আধুনিক এ অভিধায়। মোহিতলাল 'সত্যসুন্দর দাস' এ ছদ্মনামে বিভিন্ন কাগজে, বিশেষ করে 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় অতি-আধুনিকদের মুণ্ডপাত করতেন প্রায়ই।

অতি-আধুনিকরাও ছাড়বার পাত্র নন। তাঁরা বয়সে কাঁচা বলে তাঁদের জেদও সে অনুপাতে বেশী। অগত্যা তারাও 'মহাকাল' ম্যাক

দিয়ে এক অনিয়মিত মাসিক বের করে শুরু করলেন মোহিতলালের মুণ্ডপাত করতে। মোহিতলালের নাম হলো তাঁদের ভাষায় 'মোহিতপাল'। ঐ নামের নানা ব্যঙ্গরচনায় তাঁরা ধোলাই করতে লাগলেন মোহিতলালকে প্রায় প্রতি সংখ্যায়।

খুব সম্ভব ১৯৩১-এ ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলন শেষে কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর দেওয়ানবাজারের বাসায় এক ঘরোয়া ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে আমরা কর্মীরাও কেউ কেউ উপস্থিত ছিলাম। মোহিতলালও আমন্ত্রিত। এসেছিলেন, কিন্তু ভোজ্য বস্তু স্পর্শ করেননি। এ তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামি না অন্য কোন কারণ তা এখন বলতে পারবো না। ঐ বৈঠকে তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন মনে পড়ে উদাত্ত আর গম্ভীর কণ্ঠে। তিনি দেখতেছিলেন নিকষ কালো, স্বভাবে কিছুটা গোঁয়াড়, সাহিত্য-বিচারে প্রায় একচোখা—তবে তাঁর যোগ্যতা আর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কারো মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। উন্নাসিক ছিলেন সব ব্যাপারে। চাকরি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু দেখতে পারতেন না পূর্ব বাংলা নামক ভূখণ্ড আর তাঁর অধিবাসীদের। যে-সব মুসলমান ছেলের উচ্চারণ বিশুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গীয় হতো না তাদেরে শুধু 'বাঙ্গাল' বলে ক্ষান্ত হতেন না। তিনি সোজা বাড়ী গিয়ে হালচাষের পরামর্শ দিয়েও বসতেন। আজকের দিনে হলে দাঙ্গা বেঁধে যেত। জসিমউদ্দীনের অগোচরে জসিম উদ্দীনকে ত 'অশিক্ষিত কবি' তাঁর ভাষায় Unlettered-ই বলতেন! জসিম উদ্দীন স্রেফ কবি, পণ্ডিত নয়। এতে কবির জন্য প্রশংসনীয় গুণ, মোহিতলাল তা বুঝতে চাইতেন না। তখন সংস্কৃত আর বাংলা একই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর তার প্রধান ছিলেন ডক্টর সুশীলকুমার দে—মোহিতলালের দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর জোরেই শুধু মাত্র বি. এ. পাশ হয়েও মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছিলেন লেকচারারের চাকরি।

সে মোহিতলালকে বুদ্ধদেব বসু তাঁর গল্পে ললিতচন্দ্রের বেনামিতে এভাবে হাজির করেছেন আমাদের সামনে:

"ললিতচন্দ্র বিশুই পশ্চিমবঙ্গীয় বাজে শিবপুরে জন্মগ্রহণ করে। উত্তরপাড়ার স্কুলে এবং হাওড়ার কলেজে বিদ্যাভ্যাস করে তিনি বাগ-বাজারের নীলকান্ত পাঠশালায় বঙ্গভাষার শিক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সেখানে কুড়ি বছর কাজ করার পরে তার মাইনে যখন চল্লিশ থেকে ষাটে এসে ঠেকেছে এবং উচ্চাশার শেষ সোপানে এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টারের চেয়ারটা যখন তাঁর কল্পনাকে শুড়শুড়ি দিচ্ছে, এমন সময় ভাগ্য তাঁকে নিয়ে একটু তামাশা করলো। হঠাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারের পদ তিনি পেয়ে গেলেন। তিনি বি- এ. পাশ মাত্র, কিন্তু তাতে কী? তিনি কবি—এবং সমালোচক। তাঁর ভক্ত সংখ্যা কম নয়, উঁচুদরের অধ্যাপক মহলেও কেউ কেউ তাঁর প্রাণের বন্ধু। কে বলে বাংলাদেশে প্রতিভার আদর নেই, কে বলে বাঙ্গালী বন্ধুতার মূল্য দিতে জানে না।"

ঐ গল্পে রমনা আর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ অত্যন্ত স্বচ্ছ আর একান্ত হয়ে উঠেছে নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদে:

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল বাদশাহী ধরনের। লর্ড কার্জন যখন বাংলাকে দু'টুকরো করেছিলেন তখন ঢাকা শহরকে গভর্নমেন্টের পীঠস্থান-রূপে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো; সেই প্রস্তুতির নামই রমনা। বঙ্গভঙ্গ নাকচ হ'য়ে যাবার পর প্রায় সমস্ত রমনাটাকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাস ক'রে বসলো। সেক্রেটারিয়েটের ঘরগুলি বিদ্বজ্জনের বক্তৃতায় গুমগুম করতে লাগল, লাটের নাচঘরে, পরীক্ষার আপিসে, দরবার-ভবনে, ল্যাবরেটরি এবং সরকারী স্বর্গের কেষ্টবিষ্টুদের জন্য যেসব বিলেতি ছাদের বাসভবন তৈরী করা হয়েছিল সেগুলোতে জ্ঞানমার্গের বিভিন্ন দিকপালেরা বিরাজ করতে লাগলেন। রমনার উত্তরপ্রান্তে দু-চারঘর জজমাজিষ্টর রইলেন, একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও শ্বেতাঙ্গদের ক্লাবঘরও রইলো, কিন্তু সেগুলি রমনার অলংকার মাত্র। ছাত্র ও ছাত্রী, প্রফেসর, ডীন, প্রভোষ্ট, রীডার ও লেকচারার—এরাই রমনার রক্তমাংস।"

এ পরিবেশেই মোহিতলালের আবির্ভাব। অসামান্য দক্ষতার সাথে সে পরিবেশের কেষ্টবিষ্টুদের অন্যতম মোহিতলালকে বুদ্ধদেব কিছুটা শ্লেষ আর তির্যক ভংগিতে আরো সুনিশ্চিত ও স্পষ্টতর করে তুলেছেন

এভাবে : "দীনু মল্লিকের গলির একতলা রাতারাতি নীলখেতে বদলি হয়ে ললিত চন্দ্রের টাল সামলে নিতে একটু সময় লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাঁকজমক দেখে তিনি প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলেন, কিন্তু সেটা নিজের কাছেও তিনি স্বীকার করলেন না। ইংরেজীতে যাকে বলে চীক, সেটা প্রচুর পরিমাণে ছিলো তার, পেশীবহুল পালোয়ানী ভাষায় ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে অজ্ঞ প্রমাণ করে তিনি সমালোচক হিসেবে নাম কিনেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে নীলখেতের বাগানওয়ালা বাড়ি, তিনটে চাকর, সপ্তাহে দশটি ক্লাস, বাংলাবিভাগে ছাত্রীবহুলতা, স্বনামধন্য পণ্ডিতদের সংসর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুন, কমিটি-কাউন্সিল, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাত্যহিক বিচিত্র অনুষ্ঠান সবই তিনি নিজের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানিয়ে নিলেন।

শুধু তাই নয়, তাঁর হাবভাবে কথাবার্তায় এটা খুব স্পষ্ট হয়েই প্রকাশ পেলো যে, তাঁর মতো একজন ক্ষণজন্মা কবিপণ্ডিত-যে পূর্ববঙ্গীয় ব বরদের কাছে আলোক বিতরণ করার জন্য পদ্মা পার হয়ে এসেছেন, এটা নিতান্তই তাঁর মহানুভবতা এবং এজন্য চট্টগ্রাম থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত সমগ্র পূর্ববঙ্গ যদি তাঁর পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে, তা'হলেও যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না। তৈলচিক্কন হ্রস্ব চুলের দুই প্রান্ত শিঙের মতো তুলে দিয়ে, চীনে কাপড়ের গলাবন্ধ কোটের উপর পাকানো সাদা চাদর জড়িয়ে, ফিতেওলা ইংরেজী জুতোর সঙ্গে লাল মোজা পরে এবং ধুতির কোঁচাটি ডান হাতে তুলে ধরে করিডোর কম্পিত করে তিনি যখন চলতেন, ছাত্রেরা পাশ দিয়ে যেতে যেতে আবক্ষনত নমস্কার করতো এবং একটু দূরে গিয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেলতো। দীর্ঘকালব্যাপী রসবিগলিত তাম্বুলচর্বণের প্রাচুর্যে তাঁর ওষ্ঠাধরের রং পোড়াকয়লার মতো এবং দাঁতের রং জবাকুসুম তেলের মতো হয়েছিলো। সেই দন্তপক্তি বিকশিত ক'রে প্রচণ্ড মিনাদে তিনি মাইকেল পড়াতেন এবং চার লাইন পড়িয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে নির্বোধ পূর্ববঙ্গীয়দের অপচেষ্টার এমন সুতীব্র নিন্দা করতেন যে, বেচারা বাঙ্গাল ছেলেরা স্তম্ভিত হয়ে বসে মাইকেলের পঞ্চম পংক্তিতে পৌঁছবার আগেই ঘণ্টা যেতো বেজে।"

মোহিতলালের এ এক নির্মম চিত্র। নির্মম হলেও অনেকখানি সত্য! এর পর মোহিতলালকে চিনতে আর কারো বাকি থাকার কথা নয়। তবুও মোহিতলালের ভক্তের অভাব ছিল না, এমনকি ঢাকায়ও। তাঁর কবিতা আর গদ্যের ক্লাসিকধর্মিতা, নিটোল ঘননিবদ্ধতা অনেকের প্রিয় ছিল। রচনায়, গদ্যে কি পদ্যে সামান্যতম শৈথিল্যও তিনি সহ্য করতেন না। মানুষ হিসেবে তিনি দাম্ভিক ও অহঙ্কারী ছিলেন—যা খাঁটি পণ্ডিত আর বিদ্বানের লক্ষণ নয় বলেই আমাদের ধারণা। তাঁর বিশ্ব বাংলাদেশ (আজকের পশ্চিমবঙ্গ) আর তাঁর আদর্শ বঙ্কিম—আমাদের বিশ্বাস এ ছিল তাঁর দূরতিক্রম্য সীমাবদ্ধতা, যা আমৃত্যু তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। "ভাসো আমার ভেলা" স্বনির্বাচিত গল্পসংকলন। রচনার কালানুক্রম রক্ষা করে তাঁর পছন্দসহ ত্রিশটি গল্পকে এ বইতে স্থান দিয়েছেন বুদ্ধদেব। এ বইটি পড়তে পড়তেই বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কিছু কথা মনে পড়েছে। সে সূত্রে এসে পড়েছে মোহিতলাল প্রসঙ্গও। এ লেখা তাঁরা উভয়ের কারো কারো সম্বন্ধেই পূর্ণাঙ্গ কোন বক্তব্য নয়। তেমন আলোচনাও যে নয় গোড়ায় উল্লেখ করছি সে কথা।

অজস্র গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, আলোচনা-সমালোচনা এবং অনুবাদ সহ বহু রকমের এটা-ওটা লেখা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব যে কবি তাঁর সে পরিচয়ই পাঠক-মনে বড় হয়ে রয়েছে—গল্পেও তাঁর সে পরিচয় চাপা পড়েনি। তাঁর প্রতিভা মূলত কাব্য-ধর্মী। সূক্ষ্ম পেলব, সুকোমল যে-সব অনুভূতি কবিতার প্রাণ সে-সব তাঁর গল্পেরও বৈশিষ্ট্য। 'ভাসো আমার ভেলা'র গল্পগুলিতেও সে নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বুদ্ধদেব শিল্পী সর্বতো-ভাবে। শিল্পী রূপ-গুণ ও উৎকর্ষ ছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি ভাবতেই পারেন না। রবীন্দ্রনাথের গল্পে ছাড়া প্রকৃতির এমন অপরূপ বর্ণনা অন্যত্র, অন্য কারো গল্পে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ যুগে 'শিল্পের জন্য শিল্পের' একমাত্র প্রবক্তা বোধ করি বুদ্ধদেব। দেশের আর কালের অবি-শ্রান্ত আর অকল্পনীয় রদবদলের মাঝখানেও বুদ্ধদেব রয়ে গেছেন স্বধর্মে অটল ও একনিষ্ঠ। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে এমন নির্লিপ্ত শিল্পী আর কেউ আছেন বলে মনে হয় না। এ যুগে কোন না কোন ইজমের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বেঁচে থাকা যে-কোন লেখকের পক্ষে এক দুঃসাধ্য সাধনা।

এসে সাধনায় সিদ্ধ-পুরুষদের অন্যতম বুদ্ধদেব। বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের ঘরে তাঁর আবির্ভাব। তিনি মুখ্যত শিল্পী ও মধ্যবিত্ত জীবনের। তাঁর কল্পনা আর অভিজ্ঞতার বস্তুও রচিত এ জীবনকে ঘিরেই। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের বৈষয়িক জীবনের ভাঙ্গা-গড়া, আশা-হতাশা, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদির তিনি সুনিপুণ শিল্পী। তবে এও সত্য—'সমাজসচেতন' অর্থে তিনি এ সমাজের শিল্পী নন, তা হওয়া তাঁর ব্যক্তিসচেতন ধাতের বাইরে। তিনি ব্যক্তি-জীবনের শিল্পী। ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, সাফল্য আর ব্যর্থতা নিয়ে তাঁর যে নীড় রচনা তাই হয়েছে বুদ্ধদেবের শিল্প-চেতনার উৎস। সমাজ বা দেশ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই—ব্যক্তি-জীবনের ছোট ছোট সুখ আর ছোট ছোট দুঃখ, যা নিয়ে মানুষ তথা বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবন তারই খণ্ড ছবি এঁকেছেন তিনি 'ভাসো, আমার ভেলা'র গল্পগুলোতেও। বিচিত্র ঘটনা আর প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে তাদের মনে মনে যে উপলব্ধি আর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঞ্চার তারই এক সার্থক তুলিকার বুদ্ধদেব। সহজ আর অনয়াসগতি তাঁর ভাষার এক বিশেষ গুণ। তিনি পণ্ডিত কম নন—অথচ তাঁর রচনা কোথাও তাঁর ভারবাহী হয়ে উঠেনি। তাঁর বেলায় অধীত বিদ্যা হজম হয়ে পরিণত হয়েছে প্রাণ-রসে। তাই সহজ হয়েও তাঁর রচনা এত প্রাণবন্ত আর এত ঘরোয়া। মোহিতলাল তাঁর বিপরীত। মোহিতলাল যে পণ্ডিত, দুর্দান্ত পণ্ডিত তাঁর এ পরিচয়, তার লেখা যেন ভারবাহীর মতো কাঁধে করে বয়ে বেড়ায়। তাই তাঁর লেখা কি গদ্য কি পদ্য কোথাও সহজ কিংবা হাল্‌কা হতে পারেনি। হাল্‌কা কথা বলতে গিয়েও তিনি হাল্‌কা হতে পারেননি, বা চাননি হাল্‌কা হতে। হয়তো হাল্কাপনাকে তিনি সাহিত্য বলেই মনে করতেন না। বুদ্ধদেবের রচনা লঘুপক্ষ পদ্মার বুকে পানসির মতো তা তর তর করে বয়ে চলে, কোথাও আটকায়না, গন্তব্যে পৌঁছার আগে থামে না। কোথাও পাঠককে খেতে হয় না হোঁচট, হয় না মাঝপথে থামতে কিংবা পড়তে পড়তে হাই তুলতে।

———

জীবনের নাটক

নাটক খেয়ালী কিছু নয়। জীবনকে দেখানোই নাটকের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য। কল্পনার স্থান যে নাটকে নেই তা নয়। আসলে নাটক জীবনেরই নকল—কল্পনার আশ্রয় ছাড়া সাথক নকল সম্ভব নয়। জীবনকে যে যত খাঁটিভাবে নকল করতে পারে সে-ই তত সফল অভিনেতা-অভিনেত্রী—অবশ্য যে জীবন নাটকে চিত্রিত। ভাষার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, কিন্তু প্রতিভাবান নট-নটী সে সীমায় বাঁধা পড়ে না। ভাষায় চরিত্রের যেটুকু চিত্রণ—তারা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে নিজেদের অভিনয়-কৌশলে চরিত্র আর ঘটনাকে করে তোলে অধিকতর সত্য আর বাস্তব। এ কারণে পঠিত নাটকের চেয়ে অভিনীত নাটকের আবেদন সুদূরপ্রসারী। তাই পাঠকের প্রত্যাশার চেয়ে দর্শকের প্রত্যাশা বেশী, আর তা ভিন্নতর।

কবিতায় আমরা খুঁজি কল্পনার তৃপ্তি। গদ্যে পেতে চাই বিষয়ের বিশ্লেষণী উন্মোচন, কিন্তু নাটকে চোখের সামনে দেখতে চাই আস্ত মানুষকে—দেখতে চাই তাদের ক্রিয়াকর্মের ভিতর দিয়ে। তাই কর্ম বা একশন্ নাটকের প্রাণ। জীবনও তাই। কর্ম ছাড়া জীবন অর্থহীন। মৃতজনকে নিয়ে চমৎকার কবিতা লেখা যায়। লেখা যায় গল্প-উপন্যাসও। স্মৃতিমন্থনও কম উপভোগ্য সাহিত্য নয়। নাটকে কর্ম তথা একশন্ অপরিহার্য বলে মৃত মানুষকে দিয়ে আর নিয়ে নাটক হয় না। নাটকের কুশীলবকে জীবিত হতে হয়। জীবন্ত হলে আরো ভালো। এ জন্য প্রাণবন্ত নট-নটীরাই পারে অভিনয়ে যথাযোগ্য সাফল্য দেখাতে।

সম্ভবত এ কারণেই দেখা যায় নাটক বিশেষ করে জীবন্ত জাতিরই শিল্প। যেখানে জীবনের লক্ষণ কম সেখানে শিল্প হিসেবে নাটকের তেমন আবির্ভাব ঘটেনি। জীবন এক বিচিত্র ব্যাপার। তার বিকাশ আর সম্প্রসারণও ঘটে বিচিত্র পথে। সামগ্রিকভাবে যেখানে জীবনের এ বিচিত্র হাওয়া বইতে শুরু করে, পালে লাগে দোলা, সেখানেই জীবন হয়ে উঠে প্রান-চঞ্চল ও সুদূর-অভিসারী। ভিতরে-বাইরে জীবন তখন নিজেকে দেয় ছড়িয়ে। তেমন বাঁধ-ভাঙ্গা জোয়ারের দিনে জীবনের বিকাশ কোন

সীমাই মানে না—তখন তা খোঁজে প্রকাশের নব নব পথ। এথেন্সের স্বর্ণ যুগেই গ্রীসের নাট্য-সাহিত্যেও দেখা দিয়েছিল স্বর্ণযুগ। তখন শুধু যে কালজয়ী নাটক রচিত হয়েছে তা নয়, এমন সব রঙ্গমঞ্চও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাতে এক সঙ্গে দশ হাজারের মতো দর্শকও নাটক দেখতে পারতো।

ইংলণ্ডেরও সে দশা। এলিজাবেতীয় যুগ নিঃসন্দেহে ইংলণ্ডের স্বর্ণযুগ—সে যুগেইত রচিত হয়েছে ওদেশের অপরাজেয় নাট্য সাহিত্য। শেক্সপিয়র যার সর্বোত্তম প্রতিনিধি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশেও কিছুটা জীবন—জোয়ারের চাঞ্চল্য অনুভূত হয়েছিল। নব জাগরণ তথা রেনেসাঁসের একটা খণ্ডিত চেহারা তাতেও দেখা দিয়েছল বই কি। অবশ্য এর পিছনে ছিল ইংরেজি শিক্ষা আর ঐ সাহিত্যের বিচিত্র প্রাণ রসের ছোঁয়া। যার প্রথম ফসল মধুসূদন আর পরিণত কুসুম রবীন্দ্রনাথ। এঁরা দু'জন এবং এঁদের মাঝখানে আরো অনেকে বহু উৎকৃষ্ট নাটক আমাদের উপহার দিয়েছেন। সে সঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায়, স্থায়ী রঙ্গমঞ্চও গড়ে উঠেছিল। দীনবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ, অমৃত লাল, গিরিশ ঘোষ প্রচুর নাটক লিখেছেন। পেশাদার প্রতিভাবান নট-নটীদেরও তখন ঘটেছিল আবির্ভাব। গিরিশ ঘোষ আর অমৃত লাল নিজেরাও ছিলেন খ্যাতনামা অভিনেতা। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ছিলেন কুশলী নট-শিল্পী। শিশির কুমার অধ্যাপনা ছেড়ে অভিনয় শিল্পকে জীবনের পেশা আর ব্রত করে নিয়েছিলেন। বাংলার অভিনয় জগতে তিনি আজো কিংবদন্তী হয়ে আছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনা—ফোড়নে নব জাগণের সে ধারা বাঙ্গালীর জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

কোন জাতির জীবনে জোয়ার যখন আসে তখন তা সব দিকেই আসে। এজোয়ার ভাব-জগতে যদি কোন প্লাবন না ঘটায় তা হলে তা নব জাগরণ তথা রেনেসাঁসে পর্যবসিত হয় না। রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে মানস-জাগরণ তথা মননশীলতার ক্ষেত্রে নব নব দিগন্তের উন্মোচন না ঘটলে তা কখনো সুফল প্রসূ হয় না। এ কারণে আমাদের রাজনৈতিক জাগরণ বারে বারে ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছে। আগেও একাধিকবার হয়েছে।

এবার বিরাট এক রাজনৈতিক জাগরণ আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীন বাংলায় আমাদের উত্তরণ ঘটেছে। এ সঙ্গে সাংস্কৃতিক জাগরণ যদি হাতে হাত না মিলায় তা হলে এ স্বাধীনতাও দু'দিনে অর্থহীন হয়ে পড়বে। মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না, কথাটা পুরোনো হলেও সত্য। সংস্কৃতি হচ্ছে মনের খোরাক—এ খোরাকের সাহায্যে মন-মানসের বিকাশ আর সম্প্রসারণ ঘটে। সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য, অভিনয়, চিত্র আর সংগীত এসবই হচ্ছে সংস্কৃতির বুনিয়াদ। এসবের প্রভাবে ব্যক্তির শুধু নয়, সমগ্র জাতির মন আর চরিত্র সংহত আর পরিণতি লাভ করে হয়ে ওঠে রুচিশীল আর সুস্থ। রাজনীতি যেখানে মানুষকে করে ক্ষমতা-সচেতন, সংস্কৃতি চর্চা সেখানে মানুষকে করে তোলে মনুষ্যত্ব-সচেতন। তাই নাটককে হতে হয় জীবনভিত্তিক তথা মানবিক।

সংস্কৃতির এক প্রধান অঙ্গ নাটক আর নাটকের অভিনয়। নাটক জীবনকে দেখায় বলে, জাতি নাটকের আয়নায় নিজেকে ভালো করে দেখতে পায়। দেখতে পায় নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, নিজের মহিমা আর গৌরব। মানুষ স্বভাবতই আত্ম-অচেতন, নাটক তাকে করে তোলে আত্ম-সচেতন। নাটকের ভিতর দিয়ে দেখতে পায় নিজেকে, নিজের দেশ, সমাজ আর জাতিকে। আর সে সঙ্গে মানব-চরিত্রকেও।

নাটক জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ।



স্বাধীনতার পর

স্বাধীনতার পর আমাদের এখন নতুন করে চিন্তা করতে হবে। স্বাধীনতার আগে সংগ্রামের সময় চিন্তার অত প্রয়োজন ছিল না। তখন সারা দেশের একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের হটিয়ে দেশকে শত্রু-মুক্ত করা। তখন একটা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে, মুক্তি যোদ্ধাদের যেমন তেমনি দেশের আপামর জনসাধারণকেও থাকতে হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা হাতিয়ার হাতে যুদ্ধ করেছে আর সাধারণ মানুষ নানাভাবে জুগিয়েছে তাদেরে সহায়তা। ধরতে গেলে সারা বাংলাদেশই তখন যুদ্ধ করেছে আর সাধারণ মানুষ অংশ নিয়েছে তাতে। তখন ছিল সারা দেশের, একটা যুদ্ধং দেহি মনোভাব।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধ শেষে সে পটভূমি কিন্তু আমূল বদলে গেছে। এখন উত্তেজনা আর মার-মুখো মনোভাব নয় ফুরিয়ে গেছে তার প্রয়োজন। এখন প্রয়োজন ঠাণ্ডা মাথা আর শুভবুদ্ধির। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে আমাদের নতুন করে নির্মাণ করতে আর গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা আর অসংখ্য নিষ্ঠাবান কর্মী। এখন আমাদের সামনে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা যুদ্ধ জয়ের চেয়েও কঠিন। এ কঠিন কাজের দায়িত্ব এখন আমাদের, বিশেষ করে দেশের তরুণ সমাজকে নিতে হবে। যুদ্ধের সময় যেমন আমরা ঐক্যবদ্ধ ছিলাম এখন শান্তির সময় অর্থাৎ নির্মাণ আর পুনর্গঠনের সময় আমাদের আরো বেশী করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে-এ কাজেই দেশের সব মানুষকেই মিলাতে হবে হাত। কারণ এ এক বিরাট কাজ। ধরতে গেলে দেশে আজ কিছুই নেই। সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা সব কিছু আজ এক অচল অবস্থার সম্মুখীন। আমাদের গোটা অর্থনীতি তার আনুষঙ্গিক সব সংস্থা আর প্রতিষ্ঠান আজ ভেঙে চুরমার। পাক-বাহিনী আমাদের বহু বিশেষজ্ঞকে খুন করে এমন

একটা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে যা সহজেই পূর্ণ হওয়ার নয়। দেশের এ যে এক নিদারুণ সংকট যা পাকিস্তান সামরিক গোষ্ঠী ইচ্ছাকরে সৃষ্টি করেছে, তার মোকাবেলা আমাদের করতেই হবে। সাহস আর যোগ্যতার সঙ্গে সংকটের মোকাবেলা করার উপরই নির্ভর করছে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পরিপূর্ণ সাফল্য। তখনই হবে এ স্বাধীনতা জনগণের জীবনে অর্থবহ। মানুষ যদি সুখী না হয়, যদি না হয় অভাব মুক্ত, যদি বোধ না করে পুরোপুরি নিরাপত্তা তা হলে স্বাধীনতা তার কাছে এক দম মূল্যহীন হয়ে দাঁড়াবে। সোনার বাংলার মানুষ যদি খেতে না পায়, পরতে না পায়, রোগে ঔষধ না পায়, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া দেওয়ার সুযোগ না পায়, তাহলে সোনার বাংলা কথাটার ত কোন অর্থই থাকে না তা স্রেফ এক ঠাট্টার মতোই শোনায় না কি?

তাই এখন আমাদের সংকল্পগ্রহণ করতে হবেঃ সোনার বাংলাকে আমরা সত্য সত্যই সোনার বাংলা করে গড়ে তুলবো। এজন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার আর কঠিন শ্রমের সম্মুখীন হতে আমরা দ্বিধা করবো না। বাংলাদেশের প্রতিটি ছেলে আর প্রতিটি মেয়েকে এ উদ্দেশ্যে নিজেকে তৈয়ারি করতে হবে, উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এসঙ্গে নিতে হবে এ স্বপ্নকে বাস্তবায়নের শপথ। ফাঁকি দিয়ে বড় কাজ হয় না। ত্যাগ নিষ্ঠা আর নিরলস শ্রমের পথেই আমরা আমাদের দেশকে বড় ও মহৎ করে গড়ে তুলবো। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

———

আমাদের রাজনীতি ও সংবাদপত্র

আগের দিনে 'আখবার' নামে যে সংবাদপত্রের নাম শোনা যায় তা ছিল সম্পূর্ণ সরকারী ব্যবস্থা। জনগণের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাতে ঘটতো না জনমতের কোন প্রতিফলন। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসক বা সুবেদারদের কাছে যে সব ফরমান জারী করতেন তাই শুধু প্রকাশিত হতো ঐ সব 'আখবারে'। জনমত তখনো সুনির্দিষ্ট অবয়ব গ্রহণ করেনি, জনমতের প্রতিনিধি দল বা পার্টির ও ঘটেনি আবির্ভাব। আধুনিক রাজনীতি আধুনিক কালের সন্তান, আধুনিক সংবাদপত্রও আধুনিক কালেরই দান। আধুনিক রাজনীতির মতো আধুনিক সংবাদপত্রের অস্তিত্ব, ইংরেজ আমলের আগে ছিল না বললেই চলে। এ দু'য়ের জন্যে নিঃসন্দেহে আমরা ইংরেজ শাসন আর ইংরেজী বিদ্যার কাছে ঋণী।

আধুনিক অনেক কিছুর মতো আধুনিক রাজনীতি আর আধুনিক সাংবাদিকতা আনন্দ কিছু নয়—এতেও প্রচুর খাদ রয়েছে। রয়েছে বহু ত্রুটি, বিচ্যুতি। বিকৃতি আর অপব্যবহার তেমন কোন বিরল দৃশ্য নয় রাজনীতি কিম্বা সংবাদপত্র, অথচ এ দুই-ই আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এ দুইকে বাদ দিয়ে চলা কোন দেশের পক্ষেই আজ সম্ভব নয়।

মানুষ বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিনির্ভর প্রাণী। সচেতনতা তার একবড় ধর্ম। আগের দিনে এ সচেতনার প্রকাশ ঘটতো ধর্মে, দর্শনে, গভীর জ্ঞানানুশীলনে অথবা নানা সামাজিক ক্রিয়াকর্মে। সাধারণ মানুষ আরো বহু বিষয়ে নিজেকে প্রকাশ করতো, প্রকাশের নতুন নতুন পথ সন্ধান মানুষের নিত্যকালের প্রয়াস। কিন্তু রাজা আর রাজ্য শাসনের, প্রজা সাধারণ যাকে আজকের পরিভাষায় আমরা জনগণ, জনতা বা মাস্ (Mass) বলছি তার দায়-দায়িত্ব অতি অল্প-সংখ্যক ক্ষমতাসীনের হাতে ন্যস্ত থাকতো সে যুগে। গণতন্ত্রের আবির্ভাবের পর থেকে তার চেহারা

সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ব্যক্তির শাসন গৌণ হয়ে জনতার শাসন পেয়েছে এখন থেকে প্রাধান্য। জনতার শাসন মানে জনতার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন। দেশশাসনের অ-আ-ক খ—এরই এক নাম রাজনীতি। গণতন্ত্রের আবির্ভাবের পর থেকে এ রাজনীতি অপরিহার্যভাবে গণমুখী হয়ে পড়েছে, না হয়ে পারে না। ক্ষমতার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, তেমনি অবিচ্ছেদ্য দুর্নীতিরও। এর ফলে রাজনীতিও হয়ে পড়ে দুর্নীতির এক উর্বর ক্ষেত্র। রাজনীতি আজ ক্ষমতার হাতিয়ারে পরিণত। এ হাতিয়ারের অপব্যবহার আজ এত ব্যাপক আকার নিয়েছে যে রাজনীতিবিদদের কেউ আজ সৎ মানুষ বলে বিশ্বাস করতেই চায় না। এ রাজনীতির পথ বেয়ে সংবাদপত্রেরও ঘটেছে বিস্তৃতি আর এ রাজনীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষকও সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রের মালিকগণ। কোন না কোন রাজনৈতিক দল বা ব্যাপক অর্থে সাধারণ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক, আজকের দিনে অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্ষমতার শাখা প্রশাখা, শিকড় উপশিকড় বহু আর বহু বিস্তৃত। তার অনুপ্রবেশ সর্বত্র। কোথাও কোথাও দৃশ্য কোথাও কোথাও তা থাকে অদৃশ্য। এর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব সংবাদপত্রও এড়াতে পারেনা। অথচ রাজনীতি আর সংবাদপত্র উভয়ের মূল লক্ষ্য জনকল্যাণ, জনতাকে সঠিকপথে পরিচালনা, দেশ আর সমাজের সত্যিকার চেহারা জনসমক্ষে তুলে ধরা, কোন রকম ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে দেশের ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। ঘটনার পরিবেশন আর ঘটনার বিশ্লেষণ সংবাদপত্রের বড় কর্তব্য। ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষমতা আর দক্ষতা রাজনীতিবিদদের জন্যেও অপরিহার্য। এর জন্য চাই ঘটনার গভীরে প্রবেশ এবং পটভূমি এবং ইতিহাস অধ্যয়ন। তাই রাজনীতি আর সাংবাদিকতা উভয়ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মনের প্রসারতা, বুদ্ধির প্রবীণতা যাকে বলা যায় Maturity তার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের রাজনীতি এবং সাংবাদিকতায় এ ম্যাচুরিটির অভাব অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে লক্ষ্যগোচর। ফলে এ দুই ক্ষেত্রে আমাদের কথা আর আচরণ প্রায় বালসুলভ। দায়িত্বশীলতা যা সাবালকত্বের এক বড় লক্ষণ তা আমরা কেন কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছি না। সে সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারছিনা

বাস্তববোধও। আমাদের ভূমিকা প্রায় বয়স্ক নাবালকের। আমাদের রাজনীতি আর সাংবাদিকতা দুই-ই এখন নাবালকের হাতে, তাই এ দুইক্ষেত্রে নর্তনকুর্দন আর অভিভাষণ যত দেয়া যায় তার সিকি পরিমাণও বাস্তব ভিত্তিক পরিণত বুদ্ধির পরিচয় মেলে না।

আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন পরিণত বুদ্ধি রাজনীতিবিদদের আর পরিণতভাষা সাংবাদিকের। এই দুই ক্ষেত্রে, আগের তুলনায় আমাদের মন অনেক নেমে গেছে। এটা আতংকের কথা—কারণ জাতীয় জীবনে এ দু'য়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরাই দেশকে গড়ে, চালায়, পথ দেখায়, নাবালকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে এমন দায়িত্বপালন কিছুতেই আশা করা যায় না। আমাদের রাজনীতি আর সাংবাদিকতায় নাবালকত্বের অবসান ঘটুক।

———

ফজলুল কাদের চৌধুরী : যার যা প্রাপ্য

মৃত্যুর পর কারো প্রতি কোন অসূয়া রাখতে নেই—এরকম একটা শিক্ষা আমরা আবাল্য পেয়ে এসেছি। এ শিক্ষাটা যে মানবিক এবং মহৎ চেতনারই একটি অঙ্গ তা না বললেও চলে। এমন কি সভ্য জীবন বলতে যা বুঝায়, তার সঙ্গেও এমন ব্যবহার ও উপলব্ধির সম্পর্ক নিবিড়। ফজলুল কাদের চৌধুরী একটি বিখ্যাত নাম, চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে এ নাম সুপরিচিত। সুনামে-দুর্নামে তিনি যে এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব এবং বর্ণাঢ্য চরিত্র ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এমন ব্যক্তিত্বের একটি অপ্রতিরোধ্য সম্মোহন আছে, বিশেষ করে জনতার কাছে। একটি নাটকীয় ভঙ্গিরও তিনি দক্ষ অধিকারী ছিলেন এবং লোকরঞ্জন কৌশলেও ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। হিরোইক বলতে যা বুঝায়, তাঁর চাল চলন আর বচন-বাচনে, বিশেষ করে জনসভার ভাষণে তাঁর এমন একটা অভিব্যক্তি ঘটতো যে, অতি সহজে জনগণের কাছে তিনি হয়ে উঠতেন হীরো (Hero)। এক শ্রেণীর মানুষের কল্পনায় তিনি সব সময়, সর্ব অবস্থায় হীরো হয়েই ছিলেন, তাঁর লাশ তাঁর চট্টগ্রামের বাসগৃহে নিয়ে আসার পর অগণিত মানুষের স্রোত আর জানাজায় বিপুল জনসমাগম—তারই শেষ ও নীরব বহিঃপ্রকাশ বলেই অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়।

আমরা এক জেলা আর এক শহরের বাসিন্দা হলেও ফজলুল কাদের চৌধুরীর সঙ্গে আমার তেমন আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। যদিও তাঁর দুই কনিষ্ঠ সহোদর আমার ছাত্র। আমাদের চিন্তা, মন-মেজাজ আর কর্মক্ষেত্রের সুমেরু-কুমেরু ব্যবধানের জন্যই বোধ করি এ ঘটতে পেরেছে। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর সাথে আমার বার তিনেক মাত্র দেখা হয়েছে জীবনে। প্রথমবার তাঁর এক বোনের বিয়ের মজলিসে, বর আমার প্রাক্তন ছাত্র, আমি গিয়েছিলাম বরপক্ষ থেকে আমন্ত্রিত

হয়ে। ঐ মজলিসে খান আবদুল কাইউম খানও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য—সফরে এসেছিলেন ঐ অঞ্চলে। ভোজনের আগে কি পরে মনে নেই, ফজলুল কাদের চৌধুরী তখন তাঁর সহজাত কম্বুকণ্ঠে খান আবদুল কাইউমের অজস্র গুণকীর্তন করে তাঁকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শার্দূল বলে বন্দিত করেছিলেন। আর একবারও দেখা হয়েছিল আমার অন্য এক ছাত্রের বাড়ির ভোজসভায়। সে সভায় নূরুল আমিন, মোহন মিয়া প্রভৃতি তৎকালীন পি. ডি. পি. নেতারাও উপস্থিত ছিলেন, সম্ভবতঃ ভোজটি তাঁদেরই সম্মানে। স্বভাবতঃই ফজলুল কাদের চৌধুরীর উচ্চকণ্ঠ আলাপ চলছিল উক্ত নেতাদের সাথে। পি. ডি. পি. তখন কিছুটা উন্নতির পথে। শেষবারের মতো তাঁর সঙ্গে আমার দেখা আমাদের পাড়ার এক হাই স্কুলের সম্বর্ধনা মঞ্চে। তিনি তখন পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কিংবা স্পীকার। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছু পাওয়ার আশায় তাঁকে সম্বর্ধনাদানের আয়োজন করেছিলেন। তাঁরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সে সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য। মামুলি হাত মেলানো আর কুশল বিনিময় ছাড়া এবারও তাঁর সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনার সময়-সুযোগ মেলেনি আমার। হয়তো দু'দিক থেকেই আগ্রহের অভাব ছিল। ফজলুল কাদের চৌধুরী সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতা এটুকুই। তাঁর সম্বন্ধে আমার বাদবাকি জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা শ্রুতি আর পত্রিকা-নির্ভর। কোন কোন মহলে, বিশেষ করে তাঁর ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি প্রায় কিংবদন্তীর নায়ক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বহুজনের মুখে বহু গাল-গল্প শুনেছি। তার মধ্যে কোন কোনটা খুব মুখরোচক কোন কোনটা আবার ঘৃণা উদ্রেকও। শালপ্রাংশদেহ ফজলুল কাদেরের নেতৃত্বের অনেক গুণ ছিল, লোকজ ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে অনেক স্থানিক শ্লেষ রসিকতা করে জনতাকে তিনি মুহূর্তে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত করে তুলতে পারতেন। ১৯৬৯-৭০-এ আওয়ামী লীগের জোয়ারের সময় ছাড়া তাঁকে এর আগে কখনো ভোটে পরাজিত করা যায়নি। মুসলীম ছাত্রলীগের পথ বেয়েই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু এবং মুসলিম লীগ রাজনীতিতেই তাঁর উত্তরণ। এর থেকে তাঁর কখনো বিচ্যুতি ঘটেনি। ঐ রাজনীতিতেই

তপর আস্থা আর নিষ্ঠা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর চরিত্রে দোষ আর গুণ দুই-ই ছিল। সুস্পষ্ট ও সোচ্চার, খ্যাতি আর অখ্যাতি দুই-ই ভাগ্যে জুটেছিল প্রচুর। সব সময় তাঁর হাসি ছিল অট্ট ও আকাশ-ফাটা। যেমন প্রচুর হাসতে পারতেন, তেমনি কর্কশভাষী আর কটুকণ্ঠও ছিলেন তিনি অতিমাত্রায়। তাঁর অনুগত ভক্তরাও তাঁকে যমের মতো ভয় করতো। অধীনস্থদের অবস্থা তাঁর সামনে প্রায় বলির পাঁঠার মতই ছিল। কিন্তু সে সঙ্গে তিনি অপরিমিত ভক্ত-বৎসলও ছিলেন। যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন ভক্তদের অনেক উপকার করেছেন, অনেককে অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। তাঁকে লোকে যেমন ভয় করতো, অধীনস্থরা ত বটেই অন্যরাও। আবার ভালোও বাসতো অনেকে। যারা ঘৃণা করতো, দু'চক্ষে দেখতে পারতো না তাঁর ব্যবহার, দেখেছি তারাও তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ রোধ করতে পারতো না।

তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত ছিল না কোথাও, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তাঁর যোগ্যতা। ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সম্বন্ধে ছিলেন নিঃসন্দেহ। একারণেই আইয়ুব তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত করেও নিজের পার্টি গঠনে তাঁর অপরিহার্যতা অস্বীকার করতে পারেননি। কনভেনশন লীগের প্রেসিডেণ্ট বানাবার উপযোগী তাঁর চেয়ে যোগ্যতর লোক দু'পাকিস্তানের কোথাও খুঁজে পাননি আইয়ুব। চট্টগ্রাম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, স্পীকার ও দেশের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট সর্বপদে এবং সর্ব অবস্থায় তিনি আশাতিরিক্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন; এসব পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে যথেষ্ট সাহসের পরিচয়ও তিনি নাকি দিয়েছেন বহুবার। শুনেছি, একমাত্র তাঁর সামনেই পশ্চিম পাকিস্তানী জাঁদরেল সেক্রেটারীরাও অনেকখানি বিনত ও জবুথবু হয়ে থাকতো। স্পীকার হিসেবে তাঁর সুনাম আর যোগ্যতার প্রশংসা আমি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মুখেও শুনেছি। তিনি ইংরেজী, বাংলা, উর্দু সমানে বলতে পারতেন। অনর্গল সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে তিনি পরাঙ্গম ছিলেন। তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনের সফলতার কথা আমি পাকা সাংবাদিকদের মুখেও শুনেছি। ব্যক্তি জীবনে তিনি হাম-বড়া আর আত্মম্ভরি ছিলেন।

তাই মার্জিত রুচি আর বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা তিনি আকর্ষণ করতে পারেননি কখনো। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর অসাফল্যের সব চেয়ে বড় কারণ তিনি ক্ষমতার রাজনীতি করতেন এবং রাজনীতি করতেন একমাত্র সে উদ্দেশ্যেই। এমন রাজনীতির পতন অনিবার্য এবং তা খুব কমক্ষেত্রেই বিলম্বিত হতে দেখা যায়। ক্ষমতার রাজনীতি যাঁরা করেন এখনো যাঁরা করছেন তাঁরা মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর জীবন থেকে এ শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারেন। নিঃসন্দেহে ফজলুল কাদের চৌধুরী শক্তিমান, যোগ্য এবং কিছুটা প্রতিভাবানও ছিলেন, ক্ষমতার রাজনীতির শিকার না হলে দেশ আর মানুষের অশেষ উপকার করে যেতে পারতেন তিনি এবং তখন দেশের বুকে একটা কালজয়ী আসনও নিঃসন্দেহে লাভ করতেন। তাঁর সম্বন্ধে ভাবতে গেলে এ বেদনাটাই আমি বেশী করে বোধ করি। কত বড় মহৎ সম্ভাবনা এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল! তবুও আমি মনে করি যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়া উচিত। ইতিহাসের এক পর্যায়ে ভারতীয় মুসলমানেব জন্য পাকিস্তান আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। সে আন্দোলনে ছাত্রনেতা ফজলুল কাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমি ইতিপূর্বে একাধিক প্রবন্ধে লিখেছি পাকিস্তান না হলে স্বাধীন বাংলাদেশ হতো না। বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হয়েই থাকতো। ক্ষমতার স্বল্পকালীন জীবনে তিনি তাঁর নিজ জেলায়, অন্যত্রের খবর আমার জানা নেই, বেশ কিছু জনহিতকর কাজ করে গেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর সক্রিয় অবদান রয়েছে। রাজনৈতিক আকাশ থেকে তিনি অস্তমিত হয়েছিলেন, এখন জীবন থেকেও চিরতরে মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন, আজ তিনি সব তর্কের, সব নিন্দা-প্রশংসার বাইরে। এখন তাঁর যেটুকু অবদান তা ভুলে থাকা বা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সব রাজনৈতিক নেতাই দোষে-গুণে মানুষ, খ্যাতি-অখ্যাতির শিকার। কেননা, ক্ষমতার রাজনীতি পরিণামে কিভাবে যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, অসীম সম্ভাবনার জীবনও কিভাবে ব্যর্থ হয়ে মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর জীবন তার এক উজ্জ্বলতম নজির। ক্ষমতালোভী তরুণ রাজনীতিবিদরা ফজলুল কাদের চৌধুরীর জীবন থেকে এপাঠ্যটুকু গ্রহণ করবেন কি?

বর্তমান বিশ্ব ও বাংলাদেশ

ইতিহাসের বহু ধাপ পেরিয়ে, বহু মোড় ঘুরে নানা উত্থান পতন আর সংগ্রাম তিতিক্ষার পর বাংলাদেশ আজ বিশ্বের মানচিত্রে নিজের স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বতন্ত্র আর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ। নানা মত আর ভাবাদর্শের সংঘর্ষে, বিভিন্নমুখী কর্ম-স্রোতে তাবৎ বিশ্ব আজ আবর্তিত, আলোড়িত এবং আন্দোলিত। এসবের তরঙ্গাঘাত বাংলাদেশের তটেও না লেগে পারে না। এতকাল আমরা ছিলাম পরমুখাপেক্ষী, পর নির্ভরশীল ও পর-নিয়ন্ত্রিত। আমরা যা চেয়েছি তা পাইনি, যা হতে চেয়েছি পারিনি তা হতে, যা বলতে চেয়েছি পারিনি তা বলতে। পেয়েছি পদে পদে বাধা, পারিনি ইচ্ছামতো নিজেদের গড়ে তুলতে। এতকাল আমাদের জীবন ছিল কৃত্রিম আর ফাঁকা—খুঁজে পাইনি, আমরা নিজেদের স্বকীয়তা। ছিলাম আমরা নিজ দেশে যেন পরবাসী।

বাংলাদেশ মানে আমাদের স্বদেশ অন্বেষা, যেন মাতৃভূমিতে, মাতৃকোলে ফিরে আসা। এবার আমরা খুঁজে পেয়েছি নিজেদের, আবিষ্কার করেছি, নিজের আত্মসত্তাকে শুধু নয় নিজের আত্মশক্তিকেও। এ শক্তি নিয়েই আমাদের এখন তাকাতে হবে বিশ্বের পানে। শুধু তাকানো নয়, আমাদের ভাবাদর্শের সঙ্গে যেখানে মিল রয়েছে সেখানে করতে হবে সহযোগিতা। যেখানে রয়েছে গরমিল কিংবা প্রতিকূলতা সেখানে আমাদের দিতে হবে বাধা, গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের প্রাচীর। আমরা চাই এগিয়ে যেতে, চাই সমৃদ্ধ আর সুখী সমাজ গড়ে তুলতে। চাই আমাদের দেশ থেকে যেমন তেমনি সারা বিশ্ব থেকে উঠে যাক অন্যায়, অবিচার, ঘটুক সব রকম শোষণের চির অবসান। তাই আমাদের স্থান হবে প্রগতিশীল শিবিরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দেশের

সঙ্গে হবে আমাদের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা। আমরা হাত মিলাবো সব সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার তিক্ত স্বাদ আমাদের ভালো করেই জানা। এ সমাজ ব্যবস্থাই পৃথিবীব্যাপী সব রকম শোষণের মূল উৎস। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি যুদ্ধ। যে যুদ্ধ ডেকে আনে মৃত্যু, ধ্বংস আর হাহাকার। অজস্র রক্ত আর প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে আমরা কিছুতেই যুদ্ধবাজদের, শোষণকারী-দের উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত হতে দিতে পারি না। বাংলা দেশ এদের স্বার্থ হাসিলের আর একটা রণক্ষেত্র হয়ে উঠুক এ আমরা চাই না। তাই পুঁজিবাদী যুদ্ধবাজদের শিবিরে বাংলাদেশের স্থান হবে না। বাংলাদেশ সাধারণ মানুষের দেশ এখানে পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ নেই বল্লেই চলে তথাকথিত বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাও অতি নগণ্য। তাই বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তথা সর্ব সাধারণের সুখ-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা অনেকখানি সহজ। সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার সহযোগ পেলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো আরো দ্রুত। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা সাহায্যও পেয়েছি সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকেই বেশী করে এবং তাদের সমর্থনের ফলেই যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল আর আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমাদের এক সংগ্রাম শেষ হয়েছে এখন শুরু হয়েছে আর এক সংগ্রাম—এ সংগ্রাম পুনর্গঠনের, নির্মাণের। আমাদের সব আজ বিধ্বস্ত—এ বিধ্বস্ত দেশকে নতুন করে গড়তে হবে। এ গড়ে তোলার সংগ্রাম যুদ্ধজয়ের সংগ্রামের চেয়েও কঠিনতর। যুদ্ধের একটা স্বাভাবিক উত্তেজনা আছে, সে উত্তেজনার মুহূর্তে অনেক অসাধ্য সাধনও করা যায়। কিন্তু গঠন আর নির্মাণের সময় সে উত্তেজনা আর থাকে না। তখন প্রয়োজন হয় বুদ্ধি, সুবিবেচনা আর দূরদর্শিতা। তখন প্রয়োজন হয় শিক্ষা, ট্রেনিং আর অভিজ্ঞতার। এগুলির জন্য চাই নিষ্ঠা, কঠোর শ্রম, সাধনা আর অধ্যবসায়। এসবের পেছনে উত্তেজনা নেই বলে স্বভাবতই এগুলি শুধু, নীরস আর কঠিন মনে হয়। রাইফেল হাতে শত্রুর বুকে গুলী করার চেয়ে একটা সেতু নির্মাণ, ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত কিংবা একটা স্কুলে

লেখাপড়া চালু করা ঢের ঢের কঠিন কাজ। তাই একে বলেছি কঠিনতর সংগ্রাম। এখন আমরা এ কঠিনতর সংগ্রামের মুখোমুখী।

আমাদের প্রথম সংগ্রামে যেমন আমরা বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের সহায়তা পেয়েছি, যা না পেলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কিছুতেই এত তাড়াতাড়ি শেষ হতো না—তেমনি আমাদের এ দ্বিতীয় সংগ্রামেও বহু বন্ধু রাষ্ট্রের সহায়তা আমাদের প্রয়োজন। কারণ আমাদের অনেক কিছুই নেই, যা ছিল তাও ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছে শত্রু বাহিনী। তাই এবারও এ নীরব সংগ্রামেও আমাদের সাহায্য আর সহায়তা নিতে হবে বন্ধুদেশ আর রাষ্ট্রের কাছ থেকেই। এ সব দেশ আর রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক দেশ আর রাষ্ট্র হতে হবে। কারণ আমাদের জাতীয় লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। বর্তমান বিশ্ব আমরা জানি আজ দুই সুস্পষ্ট শিবিরে বিভক্ত পুঁজিবাদী আর সমাজতান্ত্রিক। আমরা দেখেছি পুঁজিবাদই জন্ম দিয়ে থাকে সাম্রাজ্যবাদের—এ দুইয়ে মিলেই বাধায় দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। যে যুদ্ধ মানবজাতির জন্য এক বিরাট অভিশাপ। দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধ আর এ যুগে মধ্য প্রাচ্য আর ভিয়েৎনাম এ অভিশাপের মর্মান্তিক নজির হয়েই রয়েছে আমাদের সামনে। তাই গোড়া থেকেই বন্ধু নির্বাচনে আমাদের সতর্ক সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। আমরা আবারও যুদ্ধের শিকার হতে কিংবা ইন্ধন হতে চাই না। এমন কি চাই না কোন রকম যুদ্ধের সহায়ক হতেও। তাই বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান হবে যুদ্ধ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক শিবিরে। সে শিবির শান্তি, প্রগতি আর সমৃদ্ধির প্রতীক।



বাংলার মুখ দেখিয়াছি

সত্যই কি বাংলার মুখ আমরা দেখেছি? না কি কবিই শুধু কল্পনার চোখে দেখেছেন? অথবা স্বদেশ সম্বন্ধে কবির একি স্রেফ এক আবেগী মুহূর্তের অতিশয়োক্তি? এবারকার ঈদের দিনে এ সব প্রশ্নই আমার মনে ভিড় করে দেখা দিয়েছে। কবিতার অন্যতম উদ্দেশ্য কবির আবেগকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া। কবিতার এক সংজ্ঞাও তাই। এদিক থেকে জীবনানন্দ দাশের সাফল্য অনন্য এবং সন্দেহাতীত। যারা জীবনে হিজল গাছ দেখেনি এবং জানে না হিজল আর অশ্বত্থের পার্থক্য, চেনে না কোন্‌টি দোয়েল আর কোন্‌টিই বা লক্ষ্মীপেচা, তাদের মনেও তিনি ঐ সবের প্রতি তাঁর কবি-মনের আবেগকে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন। ধানসিড়ি নদীটা যে কি বস্তু, কোথায় বা তার অবস্থান তা আমারও অজানা। তবুও ঐ নাম আবৃত্তি করতে তা নিয়ে উচ্ছ্বাসিত হতে তরুণ কবিদের মতো আমারও বাধে না। হয়তো আরো অনেকের দশা আমার মতই। এক কবির উপলব্ধি তার নিজস্ব প্রতীকেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোন রকম উপলব্ধি ছাড়াই অন্যরাও যদি দেখা-দেখি তা আউড়াতে থাকে তখন তা হয় স্রেফ অনুকরণ। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' আমার বিশ্বাস তাও আজ আমাদের মুখে তেমন এক অনুকৃত বুলিতে পরিণত। আসলে বাংলার মুখ আমরা কেউই দেখিনি। বাংলার মুখ বলতে বাংলাদেশের প্রকৃতিকে শুধু বুঝায় না। বাংলার মুখ আর বাঙ্গালীর মুখ এক নয়। উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন ফরখ। এক সময় 'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো' কবিউক্তি আউড়িয়ে তরুণ বয়সে আমরা সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম, যেমন এখন 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' আউড়িয়ে আমরা হয়ে থাকি। প্রথমটি এখন উপহাস-উক্তিতে পরিণত। দ্বিতীয়টিকে, এবারকার ঈদের দিনে অধিকতর উপহাস্য মনে হয়েছে

আমার। মানুষকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের যে নিঃসর্গ নিসন্দেহে তা মনোরম, নয়নভুলানো। তবু মানতে হবে বাংলাদেশের বাইরে এমন বহু দেশ রয়েছে, যার প্রকৃতি সুন্দরতর। আসলে মানুষই প্রকৃতিকে সুন্দর করে রাখে ও তোলে। বিধাতার হাতে গড়া যে প্রকৃতি তাতে সন্তুষ্ট থাকা আর তা নিয়ে কাব্য করা চলে, সে কাব্য উপভোগ্যও যে না হয় তা নয়, কিন্তু তাতে মানুষের গৌরব কতটুকু? পাথর আল্লাহ বা প্রকৃতির সৃষ্টি, তাজমহল মানুষের। এ সৃষ্টিতেই মানুষের মহিমা। বাংলাদেশের নদ-নদী, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি আর নানাজাতের মাছ জীবনানন্দ দাশের মতো প্রকৃতিপ্রেমিক কবিদের কাব্যপ্রেরণা উৎস হতে পারে বই কি। কিন্তু কাব্যের বাইরে যে জীবন তা নিয়ে অমনতরো আবেগী কাব্য করা হয়তো দুরূহ। প্রকৃতিপ্রেমিক কবিরা তাই বোধ করি তেমন কবিতা নিয়ে মাথা ঘামান না বড় একটা। আসলে জীবনটাই ত বড়। প্রকৃতির সার্থকতাও ত জীবনের পরিবেশ হিসেবেই।

জীবন ছাড়া প্রকৃতির রূপ যতই চিত্তহারী হোক না তার মূল্য কতটুকুই বা। নির্বিকার শান্তির এক অমোঘ প্রলেপ হিসেবে জীবনানন্দ দাশের কবিতা অব্যর্থ। বাংলার প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'—এ কথা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়, যা আমরা অহরহ করে থাকি। অন্য দেশের মানুষও তাদের দেশ সম্বন্ধে অমন আবেগী হয়ে উঠলে দেখে দেওয়া যায় না। এও সত্য যে, বাংলাদেশের চেয়ে সুন্দর দেশ পৃথিবীতে বহু। সেখানকার কবিরাও হয়তো অন্য পরিভাষা বা ভিন্নতর প্রতীকে নিজেদের দেশপ্রেমকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তা পড়ে সেখানকার মানুষও হয়তো হয়ে উঠে আবেগী। তবে আমাদের মতো ওটাকে ওরা সর্বস্ব ও সর্বশেষ মনে করে না। দেশের সাত্ত্বিক রূপ ওরা স্রেফ ওখানে খোঁজে না। খোঁজে মানুষের কীর্তিতে, মানুষের রূপময় কর্মে। জীবনানন্দ দাশের বৈশিষ্ট্য, তিনি বাঙ্গালীর জীবনের দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃতির দিকে তাকিয়েই কবিতা লিখেছেন সব সময়। তাই সবুজের সুকোমল স্পর্শ রয়েছে তাঁর প্রতিটি কবিতায়। এ ক্ষেত্রে তার সাফল্য অনন্য, অদ্বিতীয় বলা চলে। কিন্তু বাংলার মুখ আর বাঙ্গালীর মুখ ত এক নয়। বিশেষ করে আজকের দিনে বাঙ্গালীর

মুখের মতো এমন হতশ্রী, বিবর্ণক্লিষ্ট মুখ আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

ঈদ আমাদের সবচেয়ে আনন্দ উৎসবের দিন, এদিনে বালক-বৃদ্ধ, মেয়ে-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সবাই নতুন জামা-কাপড়, শাড়ী-ব্লাউজে সেজে উল্লসিত হয়ে ওঠে। অতীতে বর্ণ-গন্ধ আর খুশীর সে কি জোয়ার দেখা যেত প্রতি বছর এদিনটিতে। এবারকার ঈদে তার কিছুই যেন দেখতে পাওয়া গেল না। চারদিকে শুধু দেখা গেল মানুষের নিরানন্দ মুখ আর হতশ্রী চেহারা। এর আগে প্রতি ঈদের দিনে নতুন জামা-কাপড়, শাড়ী-ব্লাউজ আর চোখ ঝোলসানো রঙ-বেরঙের দৃশ্য দেখে মন খুশীতে ভরে উঠতো। এবার তার চিহ্নটুকুও দেখতে পেলাম না। একদিন এদিনে জামা-কাপড় আর জুতা-মোজার প্রতিযোগিতায় ছেলে-মেয়েরা হয়ে উঠতো কলমুখর। এবার শিশুদের কলকণ্ঠও যেন হয়ে গেছে বোবা। অভ্যস্ত হাসিটুকুর যেন মুখ থেকে গেছে হারিয়ে। শোনা গেল না নতুন জুতার মচ্ মচ্ শব্দ কোথাও। এমন ঈদের দিনেও অধিকাংশের গায়ে দেখা গেল শুধু ময়লা ছেড়াখোড়া জীর্ণ বস্ত্র। মসজিদের দরজায় দরজায় হাতপাতা ভিখিরীর সংখ্যা অন্য বছরের তুলনায় দেখা গেল দ্বিগুণের বেশী এবার।

এখন ঈদের দিনেও বাংলার এ মুখই ত দেখতে পেলাম সর্বত্র। বলা বাহুল্য, এ মোটেও উল্লসিত হওয়ার মতো দৃশ্য নয়।

আমি কবি নই, তাই হয়তো এমন আনন্দের দিনেও, 'রূপসী বাংলা'র প্রকৃতির দিকে আমার চোখ না পড়ে পড়ছে কি-না রূপসী বাংলায় যারা বাস করে তাদের দিকে। প্রকৃতির দিকে পড়লে নিঃসন্দেহে অদৃশ্য হিজল আর অনির্ণীত ধানসিড়ি নদীর কথা আমার মনেও জেগে উঠতো। তাহলে অকারণে হয়তো এত মনোকষ্ট পেতে হতো না আমাকে এমন আনন্দের দিনেও। আমি কি নিরাশাবাদী? তা ত মনে হয় না। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি—এ এক কবি-উক্তি। কবি অন্যভাবে, তার কবিদৃষ্টি দিয়েই দেশকে দেখেছেন, সে দেখাও এক হিসেবে মিথ্যা নয়।

'কবি তব মনোভূমি রামের জন্মভূমি' এও তাই। 'সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' এও জীবনানন্দের উক্তি। আমরা প্রথম দলে পড়ি, তবে সংখ্যায় আমরা যে অনেক বেশী তা মানতেই হবে। প্রায় নিরানব্বই জন বলা যায়। আমরা যেভাবে দেখি তাতে কল্পনার স্থান কম, বাস্তব আর চাক্ষুষেরই এখানে প্রাধান্য। এ কারণ বাংলার বাস্তব চেহারা দেখে আমরা গন্তজীবীরা বিচলিত বোধ না করে আর ব্যথিত না হযে পারি না। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'—এ উক্তির পুনরুক্তি কি জানি কেন আমাকে মোটেও উচ্ছ্বসিত করে না। কারণ চারিদিকে মানুষের যে মুখ দেখতে পাই তাতে কবি-কল্পিত বাংলার মুখ কোথাও পাই না খুঁজে।

বাংলার যথার্থ মুখ দেখতে হলে বাংলাদেশের মানুষের মুখের দিকে তাকাতে হবে। তাহলে সে দেখা হবে যথার্থ আর অর্থপূর্ণ। বাংলার মুখ নিজের চোখে না দেখে আর কতকাল 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'-এ কবি-উক্তি আওড়িয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করবো আমরা? ঈদে আর নানা পরবে পার্বণে অন্ততঃ দেশের মানুষের আনন্দ-উৎফুল্ল মুখ দেখার প্রত্যাশাটি বেশী থাকে বলে, তেমন দিনে যদি বেশীর ভাগ মানুষের হতশ্রী আর বিষাদ-মলিন মুখ দেখতে হয় তাহলে ব্যথাটা মনে অত্যন্ত গভীর-ভাবে বাজে বই কি? এবারকার ঈদে আমার দশা হয়েছে তাই। এ অবস্থার অবসান না ঘটলে স্বাধীনতা দীর্ঘকাল মুষ্টিমেয়র একান্ত হয়েই থাকবে। মুখের ক্ষুদ্রতম অংশের স্ফীতি স্বাস্থ্যের নয়, রোগেরই লক্ষণ। তেমন মেদ-মাংসহীন শীর্ণদেহ গালফোলা রূপসীকে নিয়ে অতি বাজে মার্কা আবেগী কবিতাও লেখা যায় না।

—সমাপ্ত—